وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا
ইসলামী ঐক্য
ইসলামী আন্দোলন
অধ্যাপক গোলাম আযম

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا
ইসলামী ঐক্য
ইসলামী আন্দোলন

ইসলামী ঐক্য
ইসলামী আন্দোলন

অধ্যাপক গোলাম আযম

বই-কিতাব প্রকাশনী
৮৩, প্যারীদাস রোড-ঢাকা-১১০০

প্রকাশক

বই-কিতাব প্রকাশনীর পক্ষে

কাওসার মো ঃ ইফতেখার

অধ্যাপক মনযিল

৭৫, রসুলপুর, দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১২৩৬

প্রকাশ কাল ঃ

প্রথম সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৭৮

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৭৯

তৃতীয় সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৮১

চতুর্থ সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৮৪

পঞ্চম সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৮৬

ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৮৯

৭ম সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৯০

৮ম সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৯১

নবম সংস্করণ ঃ ১৯৯৪

১০ম সংস্করণ ঃ ১৯৯৬

১১শ সংস্করণ ঃ ২০০৪

মুদ্রক ঃ

আধুনিক প্রেস

২৫, শিরিশ দাস লেন,

ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ

সাদা ২৪.০০ টাকা।

অফসেট ৩০.০০ টাকা।

সূচীপত্র

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে দুনিয়ার খেলাফত দান করার ওয়াদা আল্লাহ্ করেছেন। (নূর-৫৫)

প্রকাশকের কথা

অধ্যাপক গোলাম আযম ইসলামী আন্দোলনের একজন অকুতভয় নির্ভীক সেনানায়ক। বর্তমান বিশ্বে যে কয়জন ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর জীবনের যাবতীয় কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য। তাঁর মন-মেধা, চিন্তা-ভাবনা একমাত্র সে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। এ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রেরিত কোন নবী রাসূলই সম্পূর্ণ একা অপরের সহায়তা ছাড়া আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করতে পারেননি। কোন আদর্শবাদী আন্দোলনই কোথাও একক প্রচেষ্টায় কামিয়াব হয়নি।

আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের মনগড়া সকল বাতিল মতবাদের উপর বিজয়ী করার লক্ষ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম আল্লাহর দ্বীনের সকল সৈনিকগণকে নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে একই প্লাটফরমে সমবেত হয়ে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। "ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন" পুস্তিকার এটাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকগণ এ পুস্তিকা পাঠে যদি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন তবেই লেখক হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের এ মহান চিন্তা নায়কের উদ্দেশ্য এবং প্রকাশক হিসেবে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামের বিজয়ের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার তৌফীক দান করুন। আমীন।

— প্রকাশক

একাদশ সংস্করণের ভূমিকা

১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আল্লাহ্ তায়ালা প্রায় ৭ বছরের দীর্ঘ বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনের অবসান ঘটিয়ে আমাকে দেশে ফিরে আসার সুযোগ দান করেন। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসেই এ পুস্তিকাটি রচনা করি এবং নভেম্বর মাসে তা প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে বইটি দশম বার মুদ্রিত হয়। বইটি সাময়িক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে লেখা হলেও ঐ প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি বলে প্রকাশক আবার ছাপাবার ব্যবস্থা নিয়েছেন। ৩৬ বছর আগে লেখা ভূমিকাটির বদলে বর্তমান প্রেক্ষিত অনুযায়ী নতুন করে লিখছি। বইটি বিভিন্ন জায়গায় তথ্যগত কিছু সংশোধন করতে হয়েছে সময়ের পরিবর্তনের কারণে।

বইটির আলোচ্য বিষয় আমার প্রবাস জীবনের চিন্তার ফসল। আমি পাকিস্তান আন্দোলনের ছাত্র কর্মী ছিলাম। মিঃ গান্ধি ও পন্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ" ও 'সর্ব ভারতীয় একজাতীয়তার' শ্লোগান মুসলিম জাতির স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী বিবেচনা করে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে (টুনেশন থিওরী) ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তান নামে পৃথক একটি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট দাবী জানায়।

১৯৪৫ ও '৪৬ সালে জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে এ বিষয়ে মুসলিম জনগণ পাকিস্তানের পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দেবার ফলে ইংরেজ সরকার ও কংগ্রেস দল ভারত বিভাগকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

দ্বি-জাতিত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েম হবার পর শাসকগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে। দেশের ইসলামী শক্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, বাংগালী জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা রাজনৈতিক ময়দান দখল করে নেয়। যদি রাজনীতিতে ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধ থাকতো তাহলে ইসলাম বিরোধী শক্তি একচেটিয়া ভাবে নেতৃত্ব দখল করতে পারতো না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে আসন লাভের পর ঐ ইসলাম বিরোধী শক্তিই ক্ষমতা লাভ করে। তাদের ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা সম্পর্কে যতই অবগত হচ্ছিলাম, ততই অন্তরে চরম অস্থিরতা বোধ করছিলাম।

৭২ সাল থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত রমাদান ও ঈদ উপলক্ষে মক্কা শরীফে ও মদীনা শরীফে প্রতি বছরই যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। দোয়া কবুল হবার বিশেষ জায়গায় হাজির হলে বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিগুলোর ঐক্যর জন্য মহান মাবুদের দরবারে কাতরভাবে দোয়া করতাম। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে বেদ্বীনদের শাসন থেকে মুক্তির একমাত্র পথই হলো ইসলামী ঐক্য।

মদীনা শরীফের মসজিদে "রাওদাতুল জান্নাত" (বেহেশতের বাগান) হিসাবে যে জায়গাটি রসূল (সাঃ) চিহ্নিত করে দিয়েছেন সেখানে বসে আল্লাহর দরবারে বহুবার ধরণা দিয়েছি। ঐক্য কিভাবে সম্ভব হতে পারে এ বিষয়ে চিন্তা করেছি। আর এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চেয়েছি। ৭৬ সালে মদীনা শরীফেই ঐক্যের ফর্মূলা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হলো। ১৯৭৭ সালে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের নিকট লন্ডনে আমার ঐ চিন্তার ফসল প্রকাশ করি। তিনি খুব উৎসাহ দেখালেন।

দেশে ১৯৭৮ সালে এসে ঐ চিন্তার ফসলই এ পুস্তিকাতে লিখি। উলামা ও মাশায়েখগণের নিকট বইটি পৌছাবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে যাঁরা সাড়া দেন তারা হলেন চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফের পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল জব্বার, চরমোনাইর পীর সাহেব মাওলানা সাইয়েদ ফযলুল করীম, ঢাকার প্রখ্যাত মুফাস্সিরে কোরআন মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম ও মাওলানা সাইয়েদ কাম-াল উদ্দীন জাফরী। মাওলানা সাঈদীতো আগেই একমত হয়েছেন। তাঁরা একটি কমিটি গঠন করে উলামা ও মাশায়েখগণের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন। তিন বছর যোগাযোগের পর ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে টি এন্ড টি কলোনী মসজিদে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং "ইত্তেহাদুল উম্মাহ্" নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন কায়েম করা হয়। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে "ইত্তেহাদুল উম্মাহর" প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলনে খতীবে আযম'নামে খ্যাত মাওলানা সিদ্দীক আহমদসহ অনেক নতুন ব্যক্তি এ সংগঠনে শামিল হন।

এ ঐক্য সংগঠন জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। জিলা শহরগুলোতে ইত্তেহাদুল উম্মাহর সম্মেলন উপলক্ষে স্থানীয়ভাবে যে তহবিল সংগ্রহ হতো তাতে উদ্বৃত্ত অংক কেন্দ্রে জমা হতো। ঢাকা শহরে বিরাট এক অফিস নিয়ে এ সংগঠনের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়।

এ প্ল্যাটফরমটির অগ্রগতি দেখে আশা করা গিয়েছিল যে ক্রমে সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠবে। ইত্তেহাদুল উম্মাহ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হি-সাবে ঘোষণা দিয়েই যাত্রা শুরু করে। হয়তো ভবিষ্যতে যথাসময়ে রাজনৈতিক

কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতো। কিন্তু ১৯৮৭ সালে মাজলিসে সাদারাতের (সভাপতি মন্ডলী) এক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ কতক সদস্যের অনুপস্থিতিতে অতি উৎসাহী সদস্যদের প্রচেষ্টার "ইসলামী শাসনতন্ত্রের" দাবীতে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অথচ রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করার ব্যাপারে মাজলিসে সাদারাতের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ছিল। ফলে সদস্যগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। এরপর ইত্তেহাদুল উম্মাহর গতি হঠাৎ করেই থেমে গেল।

১৯৯৭ সালে ঝালকাঠির মাওলানা আযীযুর রহমান (কায়েদ সাহেব) ও ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের উদ্যোগে ঐক্য প্রচেষ্টা নতুন করে শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে মুহতারাম খতীব মাওলানা ওবায়দুল হককে সভাপতি, মাওলানা মুহীউদ্দীন খানকে সহ-সভাপতি, মাওলানা মুফতী সাঈদ আহম-দকে মহা-সচিব এবং মাওলানা হারুনুর রশীদ খানকে যুগ্ম-মহাসচিব মনোনীত করে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল নামে একটি ঐক্যমঞ্চ গঠন করা হয়। এ মঞ্চে সকল ইসলামী মহলকে শরীক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

পাকিস্তানে দেওবন্দী, বেরেলভী, আহলি হাদীস, জামায়াতে ইসলামী, এমনকি শিয়া সহ "মুত্তাহিদা মাজলিসে আমল" নামক সর্বদলীয় ইসলামী ঐক্যজোট ২০০২ সালের অক্টোবরে জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে বিরাট সাফল্য লাভ করে। জাতীয় সংসদে এ ইসলামী ঐক্যজোট প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সীমান্ত প্রদেশে এ জোটের সরকার কায়েম আছে এবং বেলুচিস্তানে এ জোট কোয়ালিশন সরকারে শরীক রয়েছে।

এ জাতীয় ঐক্য গঠন করা গেলে বাংলাদেশেও ইসলামী শক্তি রাজনৈতিক ময়দানে বিরাট ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হতে পারে।

ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে এ বইটি বিশেষ অবদান রাখবে বলেই আমার আশা।

গোলাম আযম

রবিউল আউয়াল, ১৪২৫

এপ্রিল, ২০০৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রচনার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে যারা যেভাবেই যতটুকু দ্বীনের খেদমত করছেন তাঁদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা, মুখলিসীনে দ্বীন ও খাদেমে দ্বীনদের মধ্যে পারস্পরিক জানাজানি ও মহব্বতের পরিবেশ সৃষ্টি করে ইসলামী শক্তিকে সুসংহত করা এবং ইসলামী আন্দোলনের সকল কর্মীকে এ ঐক্য সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করাই এ পুস্তিকার প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে বিজ্ঞান সম্মত কর্মসূচী গ্রহণে সহায়তা করা এবং তৃতীয় বিশ্বের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এমন একটি কর্মসূচী রচনার প্রস্তাব পেশ করা যা সার্বজনীনভাবে যে কোন ইসলামী দলই বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী আন্দোলন গোটা বিশ্বেই বর্তমান এবং কতক দেশে ইসলামী সরকারও কায়েম আছে। বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত উৎসাহের ব্যাপার যে, তারা ইসলামের ব্যাপারে ঐ বিশ্বব্যাপী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

৭ বছর (২৩-১১-৭১ থেকে ১০-০৭-৭৮) বিদেশে থাকতে বাধ্য হওয়ায় দুনিয়ার বহুদেশ দেখার এবং মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনার সুযোগ পেয়েছি। একটি বিষয় আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলের প্রতি মহব্বত ও ইসলামের জন্য দরদের দিক দিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ অন্য কোন মুসলিম দেশের পেছনে নয়। এ দেশে ইসলামের খাদেমগণের মধ্যে ঐক্য সম্ভব হলে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ উচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বাধ্য হয়ে বিদেশে পড়ে না থাকলে যে জন্মভূমির মহব্বত এত তীব্রভাবে অনুভব করা যায় না সে কথা দেশে থাকতে কোন দিন টের পাইনি। মুসলিম হিসেবে জন্মভূমির মহব্বত এ জন্যও বেশি বোধকরা স্বাভাবিক যে, আমার মনিব আল্লাহ পাক নিজ ইচ্ছায় আমাকে এদেশে পয়দা করেছেন। আমি পরিকল্পনা করে এ দেশে পয়দা হইনি। সুতরাং আমার প্রিয় জন্মভূমিতেই দ্বীনের খেদমত করা আমার প্রধানতম কর্তব্য। এ অনুভূতির ফলেই বাংলাদেশের ব্যাপারে বিদেশে থেকেও চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হয়েছি। এমন কি কোথাও নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার খেয়াল পর্যন্ত হয়নি। এ বিশ্বাস কখনও দূর্বল হয়নি যে, আল্লাহ পাক যখন বাঁচিয়ে রেখেছেন তখন একদিন জন্মভূমিতে নিয়ে খেদমতের সুযোগও দিবেন।

বিদেশে থাকাকালে বাংলাদেশে দ্বীনের খেদমত সম্পর্কে যা ভাবতাম তার একাংশ এ পুস্তিকার মাধ্যমে প্রিয় দেশবাসীর বিবেচনার জন্য পেশ করলাম।

এ কথা প্রকাশ করা হয়তো অপ্রাসংগিক হবে না যে, বিদেশে পড়ে থাকা অবস্থায় একটা বিষয় মনে সবচেয়ে বড় সান্তনার কারণ ছিল। আমি দেশ থেকে পালিয়ে যাইনি বা হিজরতের কোন চিন্তাও করিনি। ঘটনাক্রমে আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আমি বিদেশে রয়ে গেলাম। ১৯৭১ সালের ২২শে নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি। ৩রা ডিসেম্বর করাচী থেকে ঢাকা রওনা হই। দেশের কাছে পৌছার পর ঢাকায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণের ফলে আমার বিমান জিদ্দায় যেয়ে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধাবস্থার দরুন করাচীও ফিরে যেতে পারিনি। এভাবেই বিদেশে রয়ে গেলাম। পরে পত্রিকায় খবর দেখলাম যে মুজিব সরকার আমার নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন।

এ দেশেই আমার জন্ম। বাধ্য হয়ে বিদেশে ৭ বছর থাকার আগে কোন দিনই অন্য কোন দেশে যাইনি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা পদ্ধতি চালু হবার আগে ১৯৫০ সালে একবার তাবলীগ জামায়াতের সাথে এক সফরে দিল্লী গিয়েছিলাম এবং আর একবার ১৯৫২ সালে কোলকাতা যাবার সুযোগ হয়েছিল।

এ সব কথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমার জন্মভূমির সাথে সম্পর্কটা এমন গভীর যে, বাকী জীবনটা এ দেশে আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে কাটাবার চিন্তা ছাড়া বিদেশে 'আরাম' করার সামান্যতম আগ্রহও নেই। আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দ্বীনের খেদমতে মৃত্যু পর্যন্ত যেন নিয়োজিত রাখেন এ দোয়াই সবার নিকট চাই এবং এ কারণেই এ বিষয়টা এখানে উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম।

বাংলাদেশের পটভূমি ও ইসলামের সম্ভাবনা

পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের কুশাসন, ইসলামের নামে অনৈসলামী কার্যকলাপ, গণবিরোধী নীতি ও রাজনৈতিক সমস্যা সামরিক পদ্ধতিতে সমাধানের অপচেষ্টার ফলে এ দেশের জনগনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সে সুযোগে এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের বাহকগণ বাংলাদেশে আন্দোলনকে এমন খাতে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন যার ফলে এদেশে ধর্ম নিরেপক্ষেতার মুখোশে দ্বীন ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতই নিছক পুজা পাঠ জাতীয় এবং ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ ধর্মে পরিণত করার অপচেষ্টা চলে। 'ইসলাম' 'মুসলিম' শব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উৎখাত করা হয়। পত্র-পত্রিকায় 'দাউদ হায়দার' জাতীয় ধর্মদ্রোহীদের লেখা ও কবিতায় মুসলমানদের প্রাণাধিক প্রিয় নবীর (সঃ) সম্পর্কে চরম আপত্তিকর কথা পর্যন্ত প্রকাশ পায়।

বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান তখন এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তারা এ কঠিন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এভাবেই মুসলিম চেতনাবোধ অনৈসলামী শক্তির বিরুদ্ধে দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭৫ সালে আগষ্ট বিপ্লব এবং সাতই নভেম্বরের সিপাহী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ইসলামী জাগরণ বাংলাদেশের আদর্শিক পটভূমিকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়। এরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ক্রমে ক্রমে চরম ধর্মবিরোধী শাসনতন্ত্রের ধর্মমূখী সংশোধন চলতে থাকে। বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি যেভাবেই রচনা করার চেষ্টা হোক না কেন, বর্তমানে ইসলামের নৈতিক শক্তি এতটা মজুবত যে, মুসিলম বিশ্বে বাংলাদেশের মুসলিম জনতা এখন আর অবহেলার পাত্র নয়। ইসলামের ভবিষ্যৎ অন্য কোন মুসলিম দেশ থেকে এখানে যে কম উজ্জ্বল নয় এ কথা ক্রমে সুস্পষ্ট হচ্ছে। সরকারী পর্যায়ে ইসলামের যে অবস্থাই থাকুক, এ দেশের কোটি কোটি মুসলিমের সামাগ্রিক চেতনায় ইসলামের প্রভাব ক্রমেই যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

১৯৭০ সালে জনগণ যাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন তাদেরকে গণঅধিকার আদায়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতীয়তার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়নি। সুতরাং যখন জনগণ দেখল যে, তাদের অধিকার আগের চেয়েও খর্ব করা হয়েছে এবং জনসাধারণকে সরকারের গোলামে পরিণত করা হচ্ছে এমন কি মুসলিম জাতীয়তাবোধকে পর্যন্ত ধ্বংস করা হচ্ছে তখন সবাই চরম নৈরাশ্য ও ভীষণ অস্থিরতাবোধ করল। এরই ফলে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সপরিবারে দেশের প্রেসিডেন্ট হত্যার মতো বেদনাদায়ক ঘটনার দিনটিকেও জনগণ এত উৎসাহের সাথে নাজাত দিবস হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশের ইসলামী শক্তির মজবুত ভিত্তি

ইসলাম নিজস্ব গতিতেই ইসলামের প্রথম যুগে আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সমুদ্র পথে চাটগাঁয়ের মাধ্যমে এ দেশে পৌছে। এর পর যুগে যুগে মুবাল্লিগ, অলী ও দরবেশগণের আদর্শ জীবন এদেশের জনগণকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। রাজ্য বিজয়ীদের চেষ্টায় এদেশে ইসলাম আসেনি; বরং ইসলামের প্রসারের ফলেই এখানে মুসলিম শাসনের পত্তন হয়।

এ কথা সত্য যে দ্বীন ইসলামের সঠিক ও ব্যাপক জ্ঞানের অভাবে এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে তাদের অমুসলিম পূর্ব-পুরুষদের অনেক কুসংস্কার, ভন্ড পীরও ধর্ম ব্যবসায়ীদের চালু করা শিরক-বিদায়াত, প্রতিবেশী অন্যান্য ধর্মের কতক পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি বিভিন্ন রূপে কম-বেশি চালু রয়েছে। কিন্তু এদেশে অশিক্ষিত মুসলমনদের মধ্যে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নবীর প্রতি

মহব্বত এবং মুসলিম হিসেবে জাতীয় চেতনাবোধ এমন প্রবল রয়েছে যে, সকল রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যেও কোন কালেই তা হারিয়ে যায়নি। বাংলাদেশ আন্দোলনের রাজনৈতিক তুফানে মুসলিম জাতীয়তাবোধ খতম হয়ে গেছে বলে সাময়িকভাবে ধারণা সৃষ্টি হলেও এ দেশের মুসলিম জনতা ঐ চেতনার বলিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন।

এ কথা যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ দেশের জনগণ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভাবপ্রবণ হবার ফলে কখনও কখনও রাজনৈতিক গোলক ধাঁধায় সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হতে পারে বা ভুল করতে পারে। কিন্তু চেতনভাবে কখনও ইসলামী চেতনা ও মুসলিম জাতীয়তাবোধকে তাদের জীবন থেকে মুছে ফেলতে দেয়নি। বাঙ্গালী জাতীয়তার মহাপ্লাবন এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার সরকারী অপচেষ্টা এ দেশের মুসলিম জাতীয়তাবোধের নিকট যেভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে তা বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির মজবুত ভিত্তির সুস্পষ্ট সন্ধান দেয়।

বাংলাদেশ এখন আর 'বাঙ্গালী' জাতির বাসস্থান নয়। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম 'মুসলিম দেশ' হিসেবে গৌরব বোধ করে। বাংলাদেশ ইসলামী সেক্রেটারীয়েটের মতো 'বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রসংঘের' উল্লেখযোগ্য সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে উৎসাহের সাথে যোগদান করে। শাসনতন্ত্রের কলংকস্বরূপ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে যে 'ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের' উল্লেখ ছিল এ দেশের ইসলামী চেতনাবোধ তা বরদাশত করেনি বলে শাসনতন্ত্র থেকে এ ইসলাম বিরোধী কথাটি উৎখাত হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে ইসলামের খেদমত

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানা) মেনে যারা যেভাবে দ্বীন ইসলামের যতটুকু খেদমত করার জন্য ইখলাসের সাথে চেষ্টা করেন তারাই আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। আপাতঃ দৃষ্টিতে অনেক জামায়াত বা দলে তাদেরকে বিভক্ত মনে হলেও তারা সবাই আল জামায়াতে শামিল। কোন একটি দলের আল-জামায়াতের দাবীদার হয়ে আর সব দলকে আল-জামায়াত থেকে খারিজ ঘোষণা করার কোন অধিকার নেই।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে আল-জামায়াতের পরিচালক ছিলেন সে জামায়াতে শামিল হওয়া ছাড়া মুসলমান থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর তার উম্মতগণ দুনিয়াতে যত দলেই বিভক্ত হোক সবাইকে তাঁর আল-জামায়াতভুক্ত মনে করতে হবে। অবশ্য কোরআন ও সুন্নাহর-বিরোধী মত ও পথে যারা বিশ্বাসী তাদের কথা আলাদা।

এ কথা আমাদের সবাইর মেনে নেয়া উচিত যে, আল্লাহর রাসূলের পরিচালনায় ইসলামী জামায়াত যেরূপ নির্ভুল ও সব রকম ত্রুটি থেকে পাক ছিল, নবীর পর

উম্মত দ্বারা পরিচালিত কোন জামায়াত তেমন নিখুঁত হতে পারে না। শুধু তাই নয়, রাসূল (রাঃ) যেমন দিনের পূর্ণ নমুনা ছিলেন তেমন সর্ব গুণের সমন্বয় আর কারো মধ্যে সম্ভব নয়। তাই রাসূল (সাঃ)-কে আদর্শ মেনে যারা ইখলাসের সাথে তাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন তাঁরাও সকল বিষয়েই তাঁকে পূর্ণরূপে অনুকরণ করতে সক্ষম নন। কেউ রাসূল (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক দিকে এত বেশী মন দেন যে অন্যান্য ক্ষেত্রে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় না। কেউ রাসূল (সাঃ) আনীত দ্বীনী ইল্‌মের প্রসারে এমন ব্যস্ত যে, অন্য কিছু করার মোটেই অবসর পান না। কেউ আবার যিকরের প্রতি এমন আকৃষ্ট যে অন্য কিছুতে তেমন মজা পান না। কেউ রাসূল (সাঃ)- এর সমাজ সংস্কারমূলক কাজের উপর এতটা গুরুত্ব দান করেন যে, অন্যান্য দিকে মনোযোগ কম হয়ে যায়।

ইসলামের আলোকে সমাজকে গড়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার জামায়াত গড়ে উঠে। কেউ আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য এবং আখেরাতের কামিয়াবীর জযবা ব্যক্তি জীবনে সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত। কেউ ব্যক্তি চরিত্র গঠনের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ও ইসলামী সংস্কারমূলক কাজ করা জরুরী বিবেচনা করেন। কেউ মসজিদ তৈরি বা এর হেফাযত করাকেই বড় খেদমত মনে করেন। আবার কেউ সাংগঠনিক কাজে মন না দিয়ে ওয়াযের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ইসলামী চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। কেউ ফোরকানীয়া মাদরাসার মারফত শিশুদেরকে কোরআন পাঠ শিক্ষা ও নামায শিক্ষা দানেই গোটা জীবন নিয়োজিত করেছেন। কেউ মাদরাসায় আজীবন মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আবার কেউ মসজিদে মসজিদে কোরআন পাকের তফসীর করে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করছেন। কেউ ইসলামী সাহিত্য রচনা করে এবং কেউ তা প্রকাশ করে দ্বীনের খেদমত করেন।

এসবের প্রতিটি কাজই দ্বীনের সত্যিকার খেদমত। ইখলাসের সাথে সাধ্যমত যে যতটুকু করতে চেষ্টা করেছেন তা অবশ্যই আল্লাহ পাক কবুল করবেন এবং মুসলিম উম্মতও তার খেদমত দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সব ধরনের খেদমতকে আমরা সবাই উদারভাবে গ্রহণ করি না। যে যে ধরনের কাজ করছেন সেটাকেই দ্বীনের আসল খেদমত মনে করেন এবং অন্যদের কাজকে কোন খেদমতই মনে করেন না। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ অপরের কাজের কোন কোন দোষকে বড় করে দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রচারে লেগে যান। কারো কারো এ জাতীয় কার্যকলাপ থেকে আমার মনে হয় যে, দ্বীনের প্রকাশ্য দুশমনদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলারও তাদের অবসর নেই। কোন কোন দ্বীনের খাদেম অন্য কোন দলের বিরুদ্ধে প্রচারেই চরম ব্যস্ত এসব কারণেই এ দেশে বিপুল ইসলামী শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইসলাম-বিরোধী শক্তির তুলনায় ঐক্যের অভাবে মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে আছে।

অথচ দেশের 'মুখলিসীনে দ্বীন' যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে এদেশে ইসলামের পথ রোধ করার সাহসও কেউ করবে না। এ ঐক্যের ভিত্তি রচনা করতে হলে দ্বীনের সব খাদেমকে দুটি নীতি মেনে নিতে হবে ঃ

এক ঃ যে যতটুকু পারেন বুঝেন দ্বীনের খেদমত করে যাবেন। কিন্তু কোন দ্বীনী জামায়াত বা কাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রচার করবেন না। যদি কখনো কোন জামায়াত বা খেদমত সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন হয় তাহলেও শ্রোতার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা না করে দরদী মন নিয়ে কথা বলবেন। তাদের কোন ত্রুটি বা 'কমী' আছে মনে করলে সংশোধনের নিয়তে পরামর্শ দিতে পারেন।

দুই ঃ দ্বীনের যত রকম খেদমত হচ্ছে তা যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে একে অপরের সহায়ক ও পরিপুরক সে কথা বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। অপরের সম্পর্কে সরাসরিভাবে না জেনেই বিরোধী কোন কথা শুনে বিরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। যারা যে ধরনের খেদমতে নিয়োজিত সেটাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করাই স্বাভাবিক। এ গুরুত্ববোধ ব্যতীত নিষ্ঠার সাথে কাজ করা অসম্ভব। কিন্তু অন্যান্য খেদমতকে তুচ্ছ জ্ঞান করা অন্যায়। কার খেদমত কত বড় তা একমাত্র আল্লাহ পাকই বিবেচনা করবেন।

দ্বীনের খাদেমগণের মধ্যে এ ধরনের উদার মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কয়েকটি গঠনমূলক পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ঃ

এক ঃ প্রত্যেক দলেই কিছু উদারমনা লোক পাওয়া যায়। তারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নিজেদের সহকর্মীদের মনের সংকীর্ণতা দূর করার চেষ্টা করতে পারেন।

দুই ঃ এক দলের উদারপন্থীগণ অপর দলের উদারপন্থীদের সাথে সহযোগিতা করে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

তিন ঃ নির্দলীয় কতক লোক উদ্যোগী হয়ে সব দলের মধ্যে মহব্বত ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। এ কাজটি যে দ্বীনের কত বড় মহান খেদমত সে কথা যাদেরকে বুঝবার তৌফীক আল্লাহ পাক দিয়েছেন তাঁরা অবশ্যই চেষ্টা করবেন।

বাংলাদেশে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও জামায়াতগুলোর তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। মাদরাসা (ফোরকানিয়া, হাফিযিয়া, আলীয়া ও কওমী)
২। মসজিদ
৩। পীর-মুরীদী বা খানকাহ
৪। ওয়ায-নসিহত ও দারসে কোরআন
৫। ইসলামী সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ

৬। তাবলীগ জামায়াত
৭। জামায়াতে ইসলামী
৮। ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ
৯। স্থানীয় বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান
১০। ছাত্র ও ছাত্রীদের ইসলামী সংগঠন।

আমাদের দেশে এসবের মাধ্যমে দ্বীনের যে খেদমত হচ্ছে সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে পেশ করা হচ্ছে যাতে এ সব মহান খেদমতের গুরুত্ব অনুভব করা সহজ হয়।

মাদরাসা

(ফোরকানিয়া, হাফেযিয়া, কওমী ও আলীয়া)

দ্বীনী খেদমতের মধ্যে সর্ব প্রথমেই মাদরাসার স্থান। কারণ এ মাদরাসাগুলোই দ্বীন-ইসলামের আসল ভিত্তি-কোরআন ও হাদীসকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের নিকট থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে যখন এ দেশ থেকে ইসলামকে খতম করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তখন গরীব মুসলমানদের সাহায্য ও দান নিয়ে ওলামাগণ যেভাবে মাদরাসা কায়েমের আন্দোলন করেছিলেন, সে ইতিহাস যারা জানেনা তারা মাদরাসার গুরুত্ব কি করে বুঝবে? সে ইতিহাস জানার সাথে সাথে মাদরাসাগুলো জাতিকে কি দিয়েছে সে কথা প্রতিটি মুসলমানের জানা কর্তব্য।

(ক) ফোরকানিয়া মাদরাসা ঃ ফোরকানিয়া মাদরাসার দরুনই দেশের অশিক্ষিত মুসলমানদের বিরাট অংশ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত ও নামায-রোযা শিখতে পেরেছে। দেশের সরকার যাদেরকে মাতৃভাষায় নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করা শেখাতে পারেনি তাদেরকে ফোরকানিয়া মাদরাসা আরবী ভাষায় কোরআন শিক্ষা দিয়ে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তা কে অস্বীকার করতে পারে? কোরআনের সাথে এটুকু সম্পর্কই জনগণের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে।

(খ) হাফিযিয়া মাদরাসা ঃ এ দেশে যে হারে হাফেয তৈরি হচ্ছেন আরব দেশগুলোতেও এত সংখ্যায় হাফেয পয়দা হচ্ছেন না। কোরআন মজীদের হেফাযতের এ বিরাট খেদমতের ফলে প্রতি রমযানে তারাবীহর মধ্যে সবাই অল্প সময়ে গোটা কোরআন শোনার মহা সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া কোরআনের লোভেই সহজ হয়েছে। খতমে তারাবীহ রমযানকে এক পবিত্র উৎসবে পরিণত করেছে।

(গ) কওমী বা খারেজী মাদরাসা ঃ সরকারী কোন সাহায্য না নিয়ে শুধু মুসলমান জনসাধারণের নৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতায় যারা কওমী মাদরাসাগুলো চালাচ্ছেন তারা যে কি কষ্ট করে দ্বীনের এতবড় খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন তা

ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যেরা বুঝতে অক্ষম। এসব মাদরাসায় যে ওলামা বিশেষ করে মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির তৈরি হচ্ছেন, তাঁরা দেশের গৌরব এবং দ্বীনের মহান খাদেম। এ মাদরাসাগুলো না থাকলে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে দ্বীন-ইসলামের প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল শিক্ষার কি উপায় ছিল?

(ঘ) আলীয়া মাদ্রাসা ঃ সরকারী অনুমোদনে চললেও আলীয়া মাদরাসাগুলোও প্রধানতঃ মুসলমানদের সাহায্যেই গড়ে উঠেছে। স্কুল-কলেজকে যে হারে সরকার টাকা দেন, সে তুলনায় এসব মাদরাসা সামান্যই পেয়ে থাকে। এসব মাদরাসায় পড়া ছাত্রদের এক বিরাট অংশ আজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী নেবার উছিলায় ভর্তি না হলে আধুনিক শিক্ষালাভে নিয়োজিত ছাত্র সমাজ ইসলামের আলো থেকে একেবারেই বঞ্চিত থাকত। ফাযেল ও টাইটেল পাশ ছেলেরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের যে কি বিরাট খেদমত করেছে তা অনেকেই হয়ত জানেন না। এদেরই একাংশ সরকারী অফিসে চাকুরীরত আছে বলে সেখানেও দ্বীনের আলো জ্বলে।

কওমী ও আলীয়া মাদরাসাগুলো যদি ওলামাদের বিরাট বাহিনী পয়দা না করতো তাহলে দেশের লাখো লাখো মসজিদ কোথা থেকে ইমাম সংগ্রহ করতো? প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের আরবী ও ইসলামিয়াতের শিক্ষক কোথায় পাওয়া যেত? দেশের জনপ্রিয় বড় বড় ওয়ায়েয, ইসলামী সাহিত্যিক ও আরবী থেকে বাংলায় ইসলামী কিতাবের অনুবাদক পাওয়া কি এসব মাদরাসা না থাকলে সম্ভবপর হতো? এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মাদরাসার খেদমতের পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব। শুধু মাদরাসার গুরুত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজনে কিছু পয়েন্ট পেশ করা হলো। প্রকৃত পক্ষে ওলামাগণই যে জাতির নৈতিক শিক্ষক সে কথা অনুধাবন করলে মাদরাসার গুরুত্ব সহজেই বুঝা যাবে।

দ্বীনের ইলমই নবুয়তের উত্তরাধিকার। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলেমগণকে নবীদের ওয়ারিশ বলে ঘোষণা করে দ্বীনী ইলমের এত বড় মর্যাদা দিয়েছেন। কওমী ও আলীয়া মাদরাসাগুলো না থাকলে কোরআন ও হাদীসের আকারে অহীর মারফতে রাসূল (সাঃ) এর নিকট আল্লাহ পাকের প্রেরিত জ্ঞানের মহা ভান্ডারের এমন চমৎকার হেফাযত কিছুতেই সম্ভব হতো না।

মসজিদ ঃ

মসজিদ তৈরি করা, নামাযীদের খেদমতের যাবতীয় সুব্যবস্থা করা এবং ইমাম ও মুয়ায্‌যিনের এন্তেজাম করা কোন এলাকার মুসলমানদের যে কত বড় দ্বীনী খেদমত তা সবাই উপলব্ধি করেন না। মুসলমানদের যে মহল্লায় মসজিদ নেই সে মহল্লায় ইসলামী জীবন ধারার কোন চিহ্নই নেই। তাই সরকারীভাবে কোন আবাসিক এলাকা সৃষ্টি করা হলে তাতে স্কুল, সিনেমা, পার্ক ইত্যাদির সাথে

মসজিদের কোন পরিকল্পনা না থাকলেও ঐ এলাকার কিছু সংখ্যক মুসলমানের উদ্যোগে সেখানে যখন মসজিদ গড়ে ওঠে তখনি তা মুসলমানদের মহল্লা বলে বুঝা যায়। মুসলমানদের সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে মসজিদের মর্যাদা বহাল করা হলে এর বিরাট খেদমতের পরিচয় আরও স্পষ্ট হবে।

বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, মসজিদ সমাজ ও আঞ্জুমানে ইত্তেহাদের "বাইতুশ শরফ মসজিদ" জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম সমাজে মসজিদের সত্যিকার মর্যাদা বহাল করার জন্য চমৎকার কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। যে পরিমাণে এ সবের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে সে পরিমাণেই মসজিদ জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। সাধারণভাবে মসজিদ নামাযের ঘর হিসেবেই পরিচিত। বড় জোর মসজিদকে ফোরকানিয়া মাদরাসা হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। যেখানে মসজিদ সংলগ্ন কওমী মাদরাসা আছে সেখানে অবশ্য মসজিদও ইসলামী শিক্ষাগার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মসজিদকে মুসলিম জাতির প্রধান সামাজিক ও তামুদ্দুনিক মর্যাদায় উন্নীত করা উচিত। এভাবেই মসজিদ থেকে ইসলামের সঠিক খেদমত পাওয়া যেতে পারে।

পীরের খানকাহ বা পীর—মুরীদী ব্যবস্থা ঃ

জনসাধারণকে ইসলামী জীবন যাপন শিক্ষাদান, তাদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত পয়দা করা এবং দুনিয়ার মুয়ামালাতে কোরআন-হাদীস মোতাবেক তাদেরকে পরিচালনা করা ইত্যাদি বড় বড় খেদমতের উদ্দেশ্যেই পীর-মুরীদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মুসলিম জনতার দ্বীনী প্রয়োজনেই এ ব্যস্থা চালু রয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দ্বীনী শিক্ষার অভাবের সুযোগে এবং সমাজে পীরের প্রতি ভক্তি প্রচলিত থাকায় বহু লোক পীরের কোন যোগ্যতা ছাড়াই পীর মুরশীদীর মতো মহান ব্যবস্থাটিকে নিছক পার্থিব ব্যবসা বানিয়ে জনগণের ঈমান নষ্ট করার কাজ করে যাচ্ছে। একটি সহজ উদাহরণ থেকে সমস্যাটা ভালোভাবে বোঝা যাবে। আমাদের দেশে খুব কম লোকই পাশ করা ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবার ক্ষমতা রাখে বা সুযোগ পায়। কিন্তু রোগ হলে সবাই চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করবেই। তাই দেশে এত হাতুড়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা চলছে। তারা ডাক্তারী বিদ্যা জানে না। বাজারে চাহিদা থাকার কারণেই তাদের ব্যবস্যা চলে এবং লোকদের পয়সা নিয়ে তাদেরকে মরণের পথে এগিয়ে দেয়। ঠিক তেমনি এক শ্রেণীর ভন্ড পীর মানুষের হেদায়াত ও আখিরাতের মুক্তির চাহিদার ফলে তাদের হীন ব্যবসা চালাতে সক্ষম হয়।

হাতুড়ে ডাক্তার আছে বলেই যেমন চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই খারাপ বলা চলে না, তেমনি ভন্ড পীর আছে বলেই পীর-মুরীদী ব্যবস্থাটাকেই মন্দ বলা অন্যায়। মূল্যবান

জিনিসেরই নকল বের হয়। বাজারে যে মালের চাহিদা নেই সে মালের নকল কেউই বের করে না। তাই আসল ও নকল পীরের পার্থক্য না জেনে সকল পীরকেই মন্দ মনে করা মস্ত বড় পাপ।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ), মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এবং মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ) এর মতো মহান খাদেমে দ্বীন কি পীর ছিলেন না?

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)-এর রচিত'কাসদুস সাবীল' পুস্তিকাটি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ) খাঁটি পীর চিনাবার উদ্দেশ্যেই বাংলায় তরজমা করেছিলেন। খাঁটি পীর যেমন ঈমান, ইলম ও আমলের শিক্ষক, বেআলেম ব্যবস্যায়ী পীর তেমনি ঈমানের ডাকাত।

ওয়ায—নসিহত ঃ

আমাদের দেশে ওয়াযের মাহফিলের ব্যবস্থা করে ভাল আলেম, বক্তাগণকে দাওয়াত দিয়ে এনে ইসলামী জ্ঞান বিতরণ ও ঈমানী চেতনা সৃষ্টির যে রেওয়াজ আছে তা বহু দেশে বিরল। লাখো লাখো লোকের সমাবেশে সীরাতুন্নবী উপলক্ষে বা ওয়ায-নসিহতরূপে যোগ্য আলেমগণের আকর্ষণীয় বক্তৃতার যে বিরাট প্রভাব তা এ দেশের সরকারকেও আতংকিত করতে দেখা গেছে। জনগণের মধ্যে ইসলামী জোশ ও দ্বীনের জন্য কোরবানীর জযবা পয়দা করার ব্যাপারে ওয়াযের অবদান অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

লক্ষ লক্ষ মুসলমান ওয়াযের মাহফিলে এসে দ্বীনের বহু কথা শুনতে পান। ওয়ায়েযগণের মধ্যে যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা জনগণের মধ্যে বিতরণের দিকে বিশেষ আগ্রহী তারা যদি ওয়াযের সাথে সাথে শ্রোতাদেরকে ইসলামের বুনিয়াদী ইলম হাসিল করার জন্য মাতৃভাষায় প্রকাশিত বই-পুস্তক পড়া নিজ নিজ এলাকার মসিজদে ইসলামী বই রাখা ও পড়ার জন্য তাগিদ দেন এবং মসজিদে সাপ্তাহিক আলোচনা বৈঠকের মাধ্যমে দ্বীনের তাবলীগকে ব্যাপক করার নসীহত করেন তাহলে ইসলামের বিরাট খেদমত হতে পারে। শুধু ওয়ায করে চলে আসলে গোটা ওয়ায আওয়াজেই পর্যবসিত হয়। তাই দ্বীনী কাজের প্রোগ্রাম না দিলে প্রকৃত ও স্থায়ী ফয়দা হয় না।

ইসলামী কিতাবাদি রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনা ঃ

কোরআন পাক ও হাদীস শরীফের প্রকাশনা, এর তরজমা ও অনুবাদ, বিশ্বের অতীত ও বর্তমান ইসলামী চিন্তাবিদদের সাহিত্য অনুবাদ, ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণামূলক বই রচনা ও প্রকাশনা এমন বিরাট ইসলামী খেদমত যে শিক্ষিত লোক মাত্রই এর গুরুত্ব অনুভব করবেন। উর্দু ভাষায় গত দু'শ বছরে এত বিপুল ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার ফলেই পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের শিক্ষিত

লোকদের মধ্যে যারা নামায-রোযাও ঠিকমত করে না তাদেরও ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্ট আছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ সাহিত্যের অভাবেই অনেক দ্বীনদার শিক্ষিত লোকও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা সামান্যই জানেন। পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা ও অনুবাদের যে প্রচেষ্টা শুরু হয় তা এখনও অব্যাহত আছে–এটা খুবই খুশীর বিষয়। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই বেশ সন্তোষজনকভাবে আলেমদের মধ্যে সাহিত্যিকের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ফলে ইসলামী আদর্শের পত্রিকাদিও বাড়ছে।

তাবলীগ জামায়াত ঃ

এ জামায়াত ৬টি উসুলের ভিত্তিতে মুসলমানদের ব্যক্তিজীবন গড়ে তুলবার এক ব্যাপক আন্দোলন চালাচ্ছেন। তাবলীগ জামায়াত সারা দুনিয়ায়ই কর্মতৎপর। মুসলিম সমাজ দুনিয়ার আকর্ষণে আখিরাতকে ভুলে কালেমা তাইয়েবার জীন্দেগী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদেরকে আখিরাতমুখী করার বিরাট খেদমত এ জামায়াত আঞ্জাম দিচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে এ জামায়াত মুসলমানদেরকে সংসার জীবন থেকে আলাদা হয়ে ৪০ দিন (একচিল্লা) বা ৪ মাস (তিন চিল্লা) সময় জামায়াতের সাথে কাটিয়ে মন-মগজকে দ্বীন ও আখিরাতমুখী বানাবার দাওয়াত দেয়। জনসাধারণের মধ্যে যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ তারা এ জামায়াত দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছেন। কালেমা শুদ্ধ করে পড়া ও এর অর্থ বুঝা, নামাযকে সুন্দর করা, দ্বীনের জরুরী ইলম হাছিল করা ও যিকরের অভ্যাস করা, মুসলমানদেরকে সম্মান করা, সব কাজ নিয়ত ছহীহ করে করা, আল্লাহর পথে মাঝে মাঝে কিছু দিনের জন্য তাবলীগ জামায়াতের সাথে কাটান ইত্যাদি এ জামায়াতের মূল ৬টি শিক্ষা।

তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানার দরুন অনেকে এ জামায়াত সম্পর্কে নানারকম বিরূপ মন্তব্য করেন। আমি এ জামায়াতের সাথে সাড়ে চার বছর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি বলেই এর বিরাট দ্বীনী খেদমতকে ভালভাবে বোঝার সুযোগ পেয়েছি। তাবলীগের ভাইয়েরা এ জন্যই বলে থাকেন, কিছু দিন জামায়াতের সাথে না থাকলে কি করে এর কাজকে জানা ও বোঝা সম্ভব হবে? ভাইদের এ কথাটি খুবই সত্য। ভাইদের কথাটিকে সমর্থন করেই তাদের খেদমতে আরজ করতে চাই যে, অন্যান্য জামায়াত এবং দ্বীনী খেদমতকেও নিকটে যেয়ে না জেনে তাদের সম্বন্ধে দূর থেকে কোন ধারণা করলে একই কারণে ভুল হবে।

তাবলীগ জামায়াত আখিরাতের কামিয়াবীর উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মোতাবেক জীবন যাপনের যে মহান জযবা পয়দা করছে তা দ্বারা দ্বীনের বিরাট খেদমত হবে যদি তারা মানুষের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হতে না দেন যে, তাবলীগ জামায়াত যতটুকু তালিম দিচ্ছে সেইটুকুই ইসলামের পূর্ণরূপ বা তাবলীগ জামায়াতই একমাত্র সহীহ জামায়াত।

জামায়াতে ইসলামী ঃ

এ জামায়াত ইসলামকে মানব সমাজে তেমনি পূর্ণরূপে কায়েম দেখতে চায় যেমন— আল্লাহর রাসূল (সঃ) মদীনায় কায়েম করেছিলেন। সে মহান উদ্দেশ্যেই এ জামায়াত কর্মীদের ব্যক্তি জীবন গঠন করে সমাজে ঈমানদার, খোদাভীরু ও চরিত্রবান নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে। এ জামায়াত যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করছে তা আধুনিক শিক্ষিতদেরকে এ দ্বীনের সুস্পষ্ট ইলম দান করতে সক্ষম। আধুনিক বিশ্বে ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও চিন্তা-ধারা শিক্ষিত যুব সমাজকে যেভাবে পথভ্রষ্ট করছে এর সত্যিকার মোকাবিলা এ সাহিত্য দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের অভাব এ সাহিত্য দ্বারা অনেকখানি পূরণ হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষা ও আধুনিক সাধারণ শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত সমাজে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে জামায়াতে ইসলামী পরিবেশিত ইসলামী সাহিত্য সে দূরত্ব দূর করে উভয় প্রকার শিক্ষিত লোকদের মধ্যে মজবুত সেতু বন্ধন রচনা করেছে। এ সাহিত্য মাদরাসা শিক্ষিতদের আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গি দান করে এবং আধুনিক শিক্ষিতদেরকে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি দান করে। উভয় শিক্ষায় যে অভাব রয়েছে তা এ সাহিত্য দ্বারা দূর হওয়ায় শিক্ষিত সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টি হওয়া সহজ হয়েছে।

কোন আন্দোলন মানব সমাজে যে মতাদর্শ কায়েম করতে চায় তাকে সে আদর্শের উপযোগী লোক তৈরি করার কর্মসূচী অব্যশই নিতে হয়। জামায়াতে ইসলামী তাই ইসলামী চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে কর্মীদের বাস্তব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছে যাতে ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে অত্যাবশ্যক গুণাবলী পয়দা হয়। আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর যমীনে তাদের দ্বারাই কায়েম হওয়া সম্ভব যারা নিজেদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের আনুগত্য করে। জামায়াতে ইসলামী এ ধরনের লোক তৈরি করার একটি কারখানা।

যারা সত্যিই আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নিকট দ্বীন ইসলামকে যোগ্যতা ও বলিষ্ঠতার সাথে পরিবেশন করতে চান তারা মাওলানা মওদূদীর (রঃ) সাহিত্য থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, প্রেরণা ও মানোবল হাসিল করতে পারেন। বিশেষ করে নিম্নলিখিত তিনটি বই সব চেয়ে বেশি সহায়ক ঃ

(ক) তাফহীমূল কোরআন ঃ

ইহা কোরআন পাকের এমন একটি সহজ ও হৃদয়গ্রাহী তাফসীর যা পড়লে ভালভাবে কোরআন বুঝবার মজা পাওয়া যায়। যে মহানবীর (সঃ) নিকট এ কোরআন নাযিল হয়েছিল সে নবীর জীবন যে এ কোরআনেরই বাস্তব রূপ তা উপলব্ধি করা যায়। ২৩ বছরের নবুয়তের জীবনে রাসূল (সাঃ) যে বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন, কোরআন যে সে উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছিল তা সুস্পষ্টরূপ এ

তাফসীরে দেখান হয়েছে। তাফহীমুল কোরআন অধ্যয়ন করলে এ কথা অতি সুন্দরভাবে বুঝা যায় যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার দাওয়াত থেকে শুরু করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে ইসলামী হুকুমাতের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে আল্লাহ পাকের মরজী মতো গঠন করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করাবার-উদ্দেশ্যেই কোরআন নাযিল হয়েছে। এ কোরআন শুধু তেলাওয়াত করা ও তাফসীর পড়ার জন্য নয়। মুসলিমদের নিকট কোরআনের দাবী হলো রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণে ইসলামকে অন্য সব ব্যবস্থার উপর জয়ী করার জন্য জানও মাল দিয়ে জামায়াত বদ্ধভাবে চেষ্টা করতে হবে। তাফহীমুল কোরআন আল্লাহর পথে এ জিহাদেরই প্রেরণা যোগায়। কোরআন যে বাস্তব জীবনের কর্মসূচী তাফহীমূল কোরআন থেকে অতি সহজে সে কথা বোধগম্য হয়।

(খ) রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ

কয়েক খণ্ডে বিস্তৃত এ গ্রন্থে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার কোরআন-হাদীস ও যুক্তিভিত্তিক বলিষ্ঠ জওয়াব রয়েছে। জীবনের সবদিক ও বিষয় এবং ইসলাম সম্পর্কে যত রকম প্রশ্ন মাওলানা মওদূদীকে করা হয়েছে সে সবের এমন চমৎকার জওয়াব তিনি দিয়েছেন যা অন্তরকে আলোকিত করে এবং দ্বীনের ব্যাপক জ্ঞান দান করে। ইসলামের দিকে শিক্ষিত সমাজকে যারা আহ্বান জানায় তারা ঐ সব প্রশ্নেরই সম্মুখীন হয়। তাই এই বইটি জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। যে কোন প্রশ্নের জওয়াব দেবার অদ্ভুত যোগ্যতা সৃষ্টি করার যাদুকরী ক্ষমতা এ বই থেকে হাসিল করা যায়। অবশ্য মাওলানার প্রতিটি বই দ্বীনী ইলমের উজ্জ্বল মশাল। নিরপেক্ষ মন নিয়ে পড়লে তো সব চেয়ে বেশি উপকৃত হওয়া যায় তবে সমালোচনার দৃষ্টিতেই আলেম সমাজের পড়া উচিত যাতে সঠিক রায় তারা কায়েম করতে পারেন।

(গ) ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ঃ — হাকিকত সিরিজ

এ বইটি প্রকৃত পক্ষে জুমআর ধারাবাহিক খুতবা হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষাকে অতি সহজ করে পেশ করেছেন। কালেমা, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ সম্পর্কে এমন সহজ সরল যুক্তিপূর্ণ আলোচনা অতুলনীয়। মাওলানা মওদূদী (রঃ) এ বইতে অতি আকর্ষণীয় যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কালেমা নামায, রোযা, যাকাতও হজ্বকে হাদীসে ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ কেন বলা হয়েছে। মানুষের গোটা জীবন আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী যাপন করার কি কি বাস্তব ট্রেনিং এ পাঁচটি বুনিয়াদের মাধ্যমে হাসিল করা যায় তা ব্যাখ্যা করে তিনি একদিকে প্রমাণ করেছেন যে, যারা কথায় কথায় ইসলামের নাম নেয় অথচ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের গুরুত্ব দেয় না তারা যেমন সত্যিকার ইসলাম বুঝে না, তেমনি যারা নামায রোযা

করে অথচ ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কর্মক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে করে না তারাও আসল ইসলামকে কবুল করেনি।

ইসলামের এ পাঁচটি বুনিয়াদের সাথে জিহাদের আলোচনা শামিল করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে আল্লাহ পাক শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে নামায রোযার ব্যবস্থা করেনি। নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক ঐ সব বুনিয়াদী গুণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চান যা আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী করার জন্য বিশেষ জরুরী। দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলা হয়। তাই ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের সাথে জিহাদের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক। নামায় রোযা বাদ দিয়ে যারা জিহাদের বুলি আওড়ায় তারা যেমন ভ্রান্ত, তেমনি যারা নামায রোযা করে ও জিহাদের গুরুত্ব বুঝে না তারাও সঠিক পথে নেই। এ বিষয়ে বইখানী অতুলনীয়।

(ঘ) ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ ঃ

ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে কায়েম করা এবং মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান কোরআন ও হাদীস থেকে পেশ করার উদ্দেশ্য বিজ্ঞান সম্মত কর্মসূচী বা ব্যাপক কর্মৎপরতা সবার না থাকলে ও বাংলাদেশে এমন বেশ কয়টি সংগঠন রয়েছে যারা এদেশে ইসলামকে বিজয়ী দেখতে চায়। তাঁরা ইসলামের স্বার্থে কথা বলে। তাদের মধ্যে কতক জ্ঞানী লোক ও যেমন আছে, তেমনি ইসলামের আনুগত্য করার আগ্রহও কিছু লোকের আছে। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ তারা বলিষ্ঠভাবে করেন। ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ ও অর্থনৈতিক সমাধানের কথা ঐ সব সংগঠনের ম্যানিফেষ্টোতে অবশ্যই রয়েছে। সুতরাং ইসলামের প্রকৃত বিজয়ের জন্য বিজ্ঞান সম্মত কর্মসূচী তাদের যে পরিমাণই থাকুক বা ব্যক্তি গঠনের কাজ যেটুকুই করুক তারা ইসলামী আন্দোলনেরই সহায়ক। ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এদের সবাই ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী ভূমিকা পালনে সক্ষম।

এসব সংগঠনের সবাই সমানভাবে রাজনৈতিক ময়দানে কর্মতৎপর নয়। কোন কোনটি রাজনৈতিক চিন্তাধারা পোষণ করলেও নিজ নামে সক্রিয় রাজনীতি করে না। কোনটি ওলামাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কোনটি ওলামা প্রধান আবার কোনটি আধুনিক শিক্ষিতদের দ্বারা পরিচালিত। এ ধরনের কতক সংগঠন দেশ-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য। কিন্তু সিলেটে জেলা পর্যায়েও ওলামাদের দ্বারা সংগঠিত এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। এ ছাড়া এমন আরও কিছু রাজনৈতিক দল রয়েছে যারা তাদের গঠনতন্ত্র ও মেনিফেষ্টোতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা না দিলেও তারা ইসলামী শক্তির সহায়ক এবং প্রয়োজনের সময় তারা ইসলামের পক্ষ সমর্থন করতে দ্বিধা করেন না।

স্থানীয় বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ঃ

দেশে এমন বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠান আছে যা দেশভিত্তিক নয়। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন নামে নির্দিষ্ট কোন এলাকায় এসব কর্মরত রয়েছে। ইসলামী পাঠাগার, তাফসীর মাহফিল, কোরআন প্রচার সমিতি, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ বা সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে এসব প্রতিষ্ঠান ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে।

ছাত্র ও ছাত্রীদের ইসলামী সংগঠন ঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক ছাত্র সংগঠন আছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র শাখা হিসেবেই সাধারণতঃ এরা পরিচিত। এতগুলো ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইসলামী আদর্শের ধারক বাহক দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠান মাত্র দুটো ঃ *

ক) ইসলামী ছাত্র শিবির

খ) ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।

(ক) ইসলামী ছাত্র শিবির ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসা ও স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পৌছান, তাদেরকে সুসংগঠিত করে বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিস্তার করা এবং উন্নত ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি করার মহান দায়িত্ব এ প্রতিষ্ঠানই পালন করছে। সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাবার গুরুভার বইবার মতো আর কোন ছাত্র-সংগঠন না থাকায় ইসলাম বিরোধী ও ধর্ম নিরপেক্ষ অগণিত ছাত্র সংগঠনের মোকাবিলায় শিবির এককভাবেই ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছে।

জনগণের ময়দানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ও ওলামাদের মাধ্যমে দ্বীনের যে খেদমত হচ্ছে সেখানে কেউ বাতিলের বিরুদ্ধে একেবারে একা নয়, কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ছাত্র সমাজের মধ্যে দ্বীনের দায়িত্ব একা ছাত্র-শিবিরকেই পালন করতে হচ্ছে। ছাত্রমহল তাবলীগ জামায়াতকে তাদের আদর্শের দুশমন মনে করে না। সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ ছাত্রসংগঠনগুলোর সাথে তাবলীগ পন্থীদের কোন সংঘর্ষ হয় না। তাই আদর্শের ময়দানে ছাত্র শিবির একাই ইসলামের পতাকাবাহী হিসাবে পরিচিত বলে বাতিল পন্থীরা শিবিরের বিরুদ্ধে এতটা মারমুখি।

ইসলামপন্থী পিতামাতাও আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনে ছেলেদেরকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েই দিতে বাধ্য হয়। আলেমদের সন্তানও ঐ শিক্ষার ফলে দ্বীন থেকে দূরে চলে যেতে পারে। তাই আধুনিক শিক্ষার পরিবেশে ছাত্র শিবির মুসলিমমনা পিতামাতার সন্তানদের জন্য একমাত্র ভরসাস্থল। যেসব ছাত্র শিবিরের সাথে যুক্ত হয় তাদের সম্পর্কেই আশা করা যায় যে, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাংগনের পরিবেশ ইসলামী না হলেও তারা মন-মগজ ও চরিত্রে মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবে।এ

---

* ১৯৭৮ সালে এ বইটি যখন লিখা হয় তখন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ দুটো ইসলামী সংগঠনই ছিল। পরবর্তী কালে আরও কয়েকটি ইসলামী ছাত্র সংগঠন কায়েম হয়েছে।

হিসেবে ইসলামী ছাত্রশিবির আল্লাহ পাকের এক বড় নিয়ামত। মুসলিম অভিভাবকগণ যদি তাদের সন্তানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার সাথে সাথে মুসলিমও বানাতে চান তাহলে শিবিরের মাধ্যমেই তা সম্ভব। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের মন-মগজ ও চরিত্র ইসলাম অনুযায়ী গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। তাই ইসলাম বিরোধী মত ও পথে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে বহু ছাত্র- সংগঠন এখানে অবাধে কাজ করে যাচ্ছে এমন কি তারা শিক্ষাংগনে এতটা প্রাধান্য অর্জন করে আছে যে প্রশাসন ও সেখানে অসহায় দর্শক মাত্র। এ পরিবেশে ইসলামী ছাত্র- শিবির ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে গড়ে তুলবার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা গোটা মুসলিম জাতির জন্য গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়।

(খ) ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজে ও স্কুলে ছাত্রীদের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সমাজে মহিলাদের মধ্যে অশালীনতা, বেহায়াপনা ও উচ্ছৃংখলতা তার চেয়ে ও বেশী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভদ্র ঘরের মেয়েরা এমন কি দ্বীনদার ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত স্কুল- কলেজের পরিবেশে এমন অশালীন পোষাকের প্রতি আকৃষ্ট হয় যে, অভিভাবকগণ অসহায়ের মতো তাদের চাল-চলন সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। আধুনিকতার নামে ছাত্রী মহলের এ ধরনের প্রবণতা রোধ করা অছাত্রদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত ছাত্র সংগঠন ইসলামের ধার ধারে না বা ইসলাম বিরোধী আদর্শের ধারক, তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যে বিরাট সংখ্যক ছাত্রী বিশেষ ধরনের মন- মগজ ও চরিত্রে গড়ে উঠছে তা রীতিমতো আতংকের বিষয়। শিক্ষালয় তাদেরকে পুঁথিগত বিদ্যাটুকু ছাড়া চরিত্রবান নাগরিক বানাবার কোন ব্যবস্থা না করায় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা ছাত্রীদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা দূরদর্শী লোকদের জন্য অবশ্যই চিন্তার বিষয়। ইংরেজের গোলামীর যুগে এদেশের এক শ্রেণীর পুরুষদের মধ্যে চারিত্রিক পতন ঘটলেও তাদের পারিবারিক জীবনে মহিলাদের মধ্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও কৃষ্টি বহাল থাকায় ব্যাপক হারে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারেনি। কিন্তু বর্তমানে মহিলা অংগনের সাংস্কৃতিক প্রাচীর ভেংগে মুসলিম জাতির বংশধরদের মধ্যে দ্রুত বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রসার লাভ করছে। নারী ও পুরুষের সহশিক্ষা ও একই ধরনের শিক্ষা নিয়ে একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করা ও মেলামেশার অবাধ সুযোগের ফলে মুসলিম সমাজের পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক শাসনব্যবস্থা ভেংগে পড়ছে।

এমনি মারাত্মক পরিবেশে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামী ছাত্রী সংস্থা" নামে যে সংগঠনটি ধীর গতিতে ও মজবুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, দেশের মুসলিম অভিভাবকগণ এর মাধ্যমে তাদের শিক্ষার্থী মেয়েদেরকে হেফাযত করার সুযোগ নিতে পারেন। আধুনিক শিক্ষার

সাথে সাথে সচেতন মুসলিম মহিলা হিসেবে ছাত্রীদের মন-মগজ ও চরিত্র গঠন করার একমাত্র সংগঠনই ইসলামী ছাত্রী সংস্থা। শালীন পোষাক ও ইসলামী পর্দা যে উচ্চ শিক্ষার পথে বাধা নয় এ সংগঠনের মেয়েরা তা প্রমাণ করছে। বরং এরা বুঝাতে চায় যে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধা ও ইসলামী চরিত্রে সজ্জিতা মেয়েরাই জাতীয় উন্নতির প্রকৃত সহায়ক।

আহলি হাদীস ও হানাফী

বাংলাদেশের সকল মুসলমানই সুন্নী বা আহলি সুন্নত ওয়াল-জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। শিয়া ও আগাখানী ইসমাইলী সামান্য কিছু লোক থাকলেও তারা সাধারণ মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে সব মাযহাবের লোক এ দেশে নেই। জনসংখ্যার প্রধান অংশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলেও আহলি হাদীসের সংখ্যাও বেশ বড়।

উপরোক্ত দশ ধরনের ইসলামের খেদমত আলোচনায় হানাফী ও আহলি হাদীসের খেদমত আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এ আলোচনার প্রসংগ তা নয়। ঐ সব খেদমত যেমন হানাফী মাযহাবের লোকেরা করছেন, তেমনি আহলি হাদীসের লোকেরাও কম করছেন না।

মুসলিমদের মধ্যে ইত্তেহাদের যে মহান লক্ষ্যে সকলের দ্বীনী খেদমতকে স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজন রয়েছে সে উদ্দেশ্যেই আহলি হাদীস ও হানাফীর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য স্থাপনের গুরুত্ব আরও বেশী। আহলি হাদীস ও হানাফী মাযহাবভুক্ত সকল মুসলমানই সুন্নী এবং হকপন্থী। দ্বীনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে পূর্ণাংগ মিল রয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের যেসব বিষয়ে মত পার্থক্যের কোন অবকাশ নেই সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। যে কয়টি ক্ষেত্রে ব্যাখ্যায় মত পার্থক্যের সুযোগ রয়েছে সেখানেই মতের পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের দরুণ তাদের দ্বীন আলাদা হয়ে যায়নি।

মুসলিম জনগণের মধ্যে আহলি হাদীস ও হানাফীর মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল রয়েছে সে সবের কোন চর্চ্চা নেই। এক শ্রেণীর ধর্ম-ব্যবসায়ী তাদের মধ্যে কোথায় কোথায় বেমিল রয়েছে সেগুলোকেই ফলাও করে প্রচার করে যাতে তাদের ব্যবসা চালু থাকে। হানাফী ও আহলী হাদীসের সকল মুসলিম দ্বীনদারগণ যদি উভয়ের মধ্যে নৈকট্য ও ঐক্যের বিষয়গুলো জনগণের মধ্যে তুলে ধরেন তাহলে উম্মতের ইত্তেহাদ বাস্তবে সম্ভব হতে পারে।

ইসলামী ঐক্যের বাস্তব পন্থা

এদেশে ইসলামের যারা খেদমত করছেন তারা বহু সংগঠন, জামায়াত ও জমিয়ত ইত্যাদিতে বিভক্ত। তাবলীগ জামায়াত, আহলে হাদীস, জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির ইত্যাদি কয়েকটি সংগঠন যে পরিমাণ মজবুত দ্বীনের অন্যান্য খাদেমগণ এতটা সুসংগঠিত না হলেও তাদের মধ্যে পেশাগত এক ধরনের ঐক্যবোধ আছে। আলীয়া মাদরাসাসমূহের মুদাররিসগণ তুলনামূলকভাবে অধিকতর সংগঠিত। কওমী মাদরাসার মুদারিসগণ এতোটা না হলেও তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। পীর সাহেবান নিজ নিজ মুরিদ ও মুতাকিদগণকে স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। অবশ্য একটি শ্রেণী হিসেবে পীর সাহেবানদের কোন সংগঠন নেই। কাজী সাহেবদের সংগঠন যে পরিমাণ আছে, মসজিদের ইমামগণের তেমন নেই। ওয়ায়েযগণের পেশা ভিত্তিক কোন জমিয়ত নেই। ইসলামী সাহিত্য রচয়িতা ও প্রকাশকদেরও পৃথক কোন সমিতি নেই।

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলেমগণ উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের খেদমত ও পেশায় বিভিন্ন শক্তি হিসেবে আছেন। তাদের সবার এমন কোন প্লাট ফরম, ফোরাম বা সমিতি নেই যেখানে দ্বীনের খাদেম হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতির সামনে কোন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ ধরনের ঐক্য জোটের প্রয়োজন বোধ করেই কোন কোন মহল প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন এবং কাউন্সিল বা পরিষদ গঠন করেছেন। এসব উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও প্রকৃত ঐক্যের প্রয়োজন পূরণ করতে হলে বাস্তব পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইসলামী ঐক্যের দৃষ্টান্ত

এ বিষয়ে দুটো উদাহরণ আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছে। ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর চরম দাপটের সময়ে মুসলিম পারিবারিক আইন পরিবর্তন করার সরকারী প্রচেষ্টা চলে। উর্দু ভাষাকে পংগু করে মুসলিম কালচারকে ধর্ম নিরপেক্ষ করার ষড়যন্ত্র চলে এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম প্রাধান্য খতম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতের মুসলিমদের ঐ অসহায় অবস্থায় তাদের সকল দল ও মতের নেতাদের একটি ঐক্যজোট গঠিত হয়। এর নাম রাখা হয় "মাজলিসে মুসাওরাত" বা পরামর্শ পরিষদ। ইন্দিরা সরকার মুসলিম শক্তির ঐক্যবদ্ধ আওয়াজকে উপেক্ষা করা সম্ভব মনে করল না। মজলিসে মুসাওরাতের দু'- তিনটি সম্মেলনের বলিষ্ঠ ভূমিকা মুসলমানদের মধ্যে এমন চেতনা দৃষ্টি করল যে সরকার শেষ পর্যন্ত ঐসব ষড়যন্ত্র স্থগিত রাখতে বাধ্য হল। ভারতের মতো দেশে অসহায় সংখ্যালঘু মুসলিমগণ একমাত্র ঐক্যজোটের মাধ্যমেই দ্বীনের হেফাযতের শক্তি

সঞ্চয় করতে সক্ষম হলেন। ঐ পন্থায় ব্যর্থ হয়ে ভারতের হিংস্র একদল মুসলিম বিদ্বেষী আলিগড়ে ব্যাপক দাংগা বাঁধিয়ে মুসলমানদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করার মাধ্যমে আলিগড় বিশ্ববিদ্যারয় থেকে মুসলিম প্রাধান্য খতম করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি পাকিস্তানে। পাকিস্তান ন্যাশনাল এলায়েন্স (পি–এন–এ–) বা পাকিস্তান জাতীয় ঐক্যজোট (পি–এন–এ–) নামক প্রতিষ্ঠান মাওলানা মুফতী মাহমুদের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের উদ্যোগে গঠিত হয়। এককালে মুফতী মাহমুদের দলটি জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু মত পার্থক্য সত্ত্বেও ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে মুফতী মাহমুদ ও মাওলানা মওদূদীর মধ্যে ঐক্য স্থাপতি হবার পর মুসলিম লীগ, এয়ার মার্শাল আজগর খান, এমনকি সীমান্তের ওয়ালী খান পর্যন্ত তাদের দলবলসহ পি, এন, এ, 'তে যোগদান করে "নেযামে মুস্তফা" বা ইসলামী শাসনের আওয়াজ তুলেন। ভূট্টো শাসনের চরম দুর্দিনে এ ঐক্যজোট ব্যতীত পাকিস্তানে ইসলামের মুক্তি অসম্ভব ছিল। ইসলামের প্রাথমিক প্রাধান্য সৃষ্টি হবার পর পি, এন, এ, পরবর্তীকালে কোন শক্তি হিসাবে গণ্য না হলেও ইসলামের এ প্রাধান্যটুকু ঐ ঐক্যজোটেরই ফসল।

ভারত ও পাকিস্তানের মতো দুটো প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ইসলামী ঐক্যের যে নগদ সুফল পাওয়া গেল তা বাংলাদেশের ইসলামী মহলকে নিশ্চয়ই প্রেরণা যোগাবে। বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির ঐক্য স্থাপিত হলে পাকিস্তানের চেয়েও বেশী সুফলের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে ঐক্যের রূপ

পাকিস্তানে মতো বাংলাদেশের ওলামাদের সুসংগঠিত কোন রাজনৈতিক দল নেই। তাই যে ক'টি ইসলামী রাজনৈতিক দল আছে শুধু তাদের ঐক্যই এখানে ইসলামের ঐক্যের জন্য যথেষ্ট নয়। এ দেশের ইসলামী শক্তিগুলো চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী শক্তিগুলোর প্রতিনিধিদের দ্বারা যদি কোন সংগঠন গড়ে উঠে তাহলে এদেশের গোটা মুসলিম চেতনাকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হতে পারে।

সাধারণতঃ এ ধরনের ঐক্য দু'কারণে ব্যর্থ হয়। প্রথমতঃ ঐক্যজোটের নেতৃত্ব নিয়ে চরম মতভেদ দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ ঐক্যের পেছনে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য না থাকলে বিভিন্ন গ্রুপ নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ঐক্যের প্লাটফরমকে ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

তাই এ দুটো সমস্যার পরিষ্কার সমাধান এ জাতীয় ঐক্যজোটের কামিয়াবীর পয়লা জরুরী শর্ত। এর সমাধান হিসেবে আমার সুচিন্তিত প্রস্তাব নিম্নরূপ ঃ-

ইসলামী শক্তিগুলোর প্রতিনিধিদের দ্বারা যে কেন্দ্রীয় মাজলিস গঠিত হবে কোন এক ব্যক্তি এর সভাপতি হবেন না। প্রতিনিধিদের সবাই সভাপতি হিসেবে গণ্য

হবেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে মাজলিসের "সভাপতি মন্ডলী" বলা হবে। এ কমিটির বৈঠক পরিচালনার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সভাপতিত্ব করবেন। বৈঠকের বাইরে তিনি মাজলিসের সভাপতি হিসাবে বিবেচিত হবেন না। কেন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বয়স অনুপাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির সভাপতিত্বে কাজ চলবে। এভাবে কাজ করা হলে কোন এক ব্যক্তির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

অবশ্য যখন কোন সম্মেলন হবে তখন সকলকেই এমনভাবে বিভিন্ন মর্যাদা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সভাপতি মন্ডলীর সবাই গুরুত্ব পান। এভাবেই নেতৃত্বের কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়া থেকে মজলিসকে রক্ষা করা যাবে ইন্‌শাআল্লাহ।

ঐক্যজোটের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত থাকলে দ্বিতীয় সমস্যার সামাধানও হয়ে যাবে। এ ঐক্যজোট কোন রাজনৈতিক প্লাটফরম হবে না। নির্বাচনেও প্রার্থী মনোনয়ন দেবে না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে এদেশে ইসলাম ও মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্ব করা। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ-

(ক) ইসলামী বিধান সম্পর্কে মাজলিসের সবার মধ্যেই যেসব বিষয়ে কোন মতভেদ নেই সে বিষয়ে ঐক্যমত ঘোষণা করা, যাতে অন্ততঃ ঐ সব ক্ষেত্রে মুসলিম জনসাধারণ সঠিক হেদায়াত পায়। এর ফলে জাহেলিয়াত, সুস্পষ্ট বেদয়াত ও ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজের প্রচলন কমতে থাকবে এবং বাস্তব জীবনে ইসলামকে অনুকরণ করার প্রেরণা বাড়বে।

(খ) দেশের সরকার যা কিছু করছেন তা ইসলামের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে সঠিক বক্তব্য পেশ করা, যাতে সরকার ভুল করলে নিজেদেরকে সংশোধন করার সুযোগ পান। এধরনের একটি প্লাটফরম থেকে ইসলামের যে রায় প্রকাশ করা হবে তার বিপরীত কাজ করা সরকার এত সহজ মনে করবেন না, যত সহজ এখন মনে করেন। বর্তমানে ইসলামের এতীম অবস্থা। তাই ইসলামের পৃষ্ঠপোষক শক্তি অত্যন্ত জরুরী।

(গ) দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে ইসলামের বিপরীত কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য ঐক্যজোটের সুচিন্তিত অভিমত যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। পাকিস্তান আমলে ওলামাদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫০ সালে সর্বশ্রেণীর ৩১ জন ওলামার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের যে ২২ দফা মূলনীতি রচিত হয়েছিল তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কোন শাসনতন্ত্র সেখানে রচিত হতে পারেনি।

এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যদি ইসলামী শক্তিগুলোর প্রতিনিধিগণ একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে এদেশে ইসলামের বিজয় অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।

এ ব্যাপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইসলামী শক্তিগুলো চিহ্নিত করা। কোন্ কোন্ গ্রুপ, দল, শ্রেণী বা পেশার লোক থেকে প্রতিনিধি নেয়া হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারিত হওয়ার উপরই এ ঐক্যজোটের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে। আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত মহল এ উদ্দেশ্য গণ্য। এবিষয়ে চূড়ান্ত মতের দাবী আমি করি না। কিন্তু এদের প্রতিনিধিগণ যদি আর কোন মহলকে এতে শামীল করতে চান তাতে কোন অসুবিধার কারণ নেই।

১। জমিয়তে আহলী হাদীস

২। জমিয়তুল মুদাররিসীন (আলিয়া মাদরাসা)

৩। হক্কানী পীর ছাহেবানদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি

৪। ওলামায়ে দেওবন্দ (কওমী মাদরাসা)

৫। তাবলীগ জামায়াত

৬। ওলামা ও মাশায়েখে সিলেট

৭। কাজী সমিতি

৮। ইসলামি রাজনৈতিক দলসমূহ

৯। অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন (দেশ-ভিত্তিক)

এসব ইসলামী শক্তির এক একজন প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় "সভাপতি মন্ডলী" গঠিত হলে তারা এ প্লাটফরমের একটা নাম ঠিক করবেন।

সভাপতি মন্ডলী যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। মাজলিসের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একটি সম্পাদকমন্ডলী থাকবে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকেই একজন করে সম্পাদক নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামো সভাপতিমন্ডলীই ঠিক করবেন।

দেশে ইসলামী শক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি বলিষ্ঠ ঐক্যজোট বা প্লাটফরম সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেসব প্রতিষ্ঠানের নাম উপরোক্ত তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে ভিন্ন মতও থাকতে পারে। যদি প্রকৃত ঐক্যের লক্ষ্য সম্পর্কে সবাই আগ্রহশীল হন তাহলে একত্রে বসে পরামর্শের ভিত্তিতে চূড়ান্ত তালিকা তৈরী করা সম্ভব।

পূর্ব বর্ণিত ১০ প্রকার দ্বীনী খেদমতের কোনটাকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। এসব খেদমতই একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। কোন এক ধরনের খেদমত দ্বারা দ্বীনের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না। সবার কাজ মিলে দ্বীনের যে বিরাট খেদমত হচ্ছে তা উপলব্ধি করার যোগ্যতা আল্লাহ পাক সবাইকে দান করুন প্রত্যেক মুখলিস খাদেমে দ্বীনের এটাই কাম্য হওয়া উচিত। আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইসলামের ঐক্যের জন্য ইখলাসের সাথে কাজ করার তৌফীক দান করুন-আমীন।

বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির ঐক্যের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুভব করার জন্য একটি বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সবার সতর্ক দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই। দুনিয়ার মানচিত্রে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো দুটো ভৌগলিক ঐক্যে মিলিত রয়েছে। আবার দূরপ্রাচ্যে ও ইন্দানেশিয়া মালোয়েশিয়া ভৌগলিক দিক দিয়ে এলাকায় যুক্ত। একমাত্র বাংলাদেশই মুসলিম দুনিয়া থেকে ভৌগলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন। শুধু তাই নয়, ভারতের মতো একটি দেশ দ্বারা এদেশটি ঘেরাও হয়ে আছে। খোদা না করুন, এদেশে যদি ভারতের তাবেদার কোন সরকার কায়েম হয় তাহলে সকল প্রকার ইসলামী শক্তিকে খতম করা তারা প্রাথমিক কর্তব্য মনে করবে। সুতরাং ইসলামের দাবীদারগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদেশে দ্বীনের বিজয়ের চেষ্টা না করলে ইসলাম বিরোধীদের হাতে কচু-কাটা হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই বাকী থাকবে না।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীতে সারা মুসলিম দুনিয়ায় ইসলামের যে নব জাগরণ দেখা যাচ্ছে তা প্রধানতঃ দুজন মহান ইসলামী চিন্তনায়কের প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই ফসল। প্রায় একই সময়ে মিসরে ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ (রঃ) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) যে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন আজ এ দুজনের চিন্তধারা ও বিপ্লবের কর্মসূচি দুনিয়ার সব দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এ সময়ে আর যেসব দেশে অন্যান্য ইসলামী চিন্তানায়কের প্রচেষ্টা স্থানীয়ভাবে ইসলামী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে সেখানেও এ দুজনের সাহিত্য ও চিন্তাধারা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইমাম হাসানুল বান্নার ইখওয়ানুল মুসলিমুন এবং মাওলানা মওদূদীর জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে কোন এক দেশে সীমাবদ্ধ নয়। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রেরিকায় এ দুটো ইসলামী আন্দোলনের সাহিত্য বহু ভাষায় তরজমা হয়ে ঐ সব দেশের ইসলামী আন্দোলনের ও সংগঠনসমূহকে চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ দুটো আন্দোলনের মাধ্যমে গড়া কর্মীর এক বিরাট সংখ্যা বিভিন্ন কারণে প্রায় সব-অকমিউনিষ্ট দেশেই পৌছে গেছে এবং তাদের মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের মধ্যে ধীরে ধীরে এ আন্দলেনের প্রসার হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কোন কর্মী বিশ্বের ঐ সব স্থানে পৌছলে দেখতে পাবে যে, তাদের ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন কোন না কোন আকারে বিরাজ করছে। তাই সর্বত্রই তিনি দ্বীনী সংগঠন তৈরী পাবেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় এ ধরনের সংগঠনে যোগ না দিলে মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করা অসম্ভব। মুসলিম দেশ থেকে উচ্চ-শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের জন্যে যারা সেখানে যান তাদের পক্ষে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র অর্জনের মহাসুযোগ লাভ করা ঐ সব সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে।

ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসানুল বান্না ১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে আততায়ীর গুলীতে শহীদ হওয়ায় তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিকে বেশীসংখ্যক সাহিত্য দিয়ে যেতে না পারলে ও তাঁর আন্দোলনের বেশ কয়েকজন চিন্তাবিদ সে অভাব পূরণ করেছেন। এ সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদীর বিপুল ইসলামী সাহিত্য ইখওয়ানদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে উভয় আন্দোলনের মধ্যে চিন্তা ও জ্ঞানে বিস্ময়কর ঐক্য দেখা যায়। আল্লাহর কোরআন ও রাসূল (সঃ) এর সুন্নাতকে মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করার এটাই স্বাভাবিক সুফল ।

ইসলামী আন্দোলনের নামে ইরানে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা শিয়ামতবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত বলে সুন্নী দুনিয়া এখনও ইরান সম্পর্কে নীরব ভূমিকা পালন করছে। এ সত্ত্বেও ইসলামের নামে ইরানে বিপ্লব সাধিত হওয়ায় আমেরিকা ও রাশিয়া দুনিয়ার সব দেশের ইসলামী আন্দোলন নিয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুদানে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হওয়ার পথে এগিয়ে চলছে। মিসর ও পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হওয়ার পথে এখনও যথেষ্ট বাধা আছে।

ইসলামী আন্দোলন দেশে দেশে

স্বাধীন বিশ্বের (অকমিউনিষ্ট দেশ) সব দেশেই ইসলামী আন্দোলন কোন না কোন আকারে ও পর্যায়ে চলছে। ইসলাম সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞানের ঐক্য সত্ত্বেও সংগত কারণেই বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী ও কর্মপন্থা নিজ নিজ দেশের পরিবেশ ও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। যে দেশে প্রকাশ্য সংগঠন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সেখানে কর্মসূচী বিশেষ ধরনের হবেই। যে দেশে সংগঠনের অনুমতি থাকলেও রাজনৈতিক মতামত নিয়ন্ত্রিত সেখানের কর্মসূচী সে ভিত্তিতেই রচিত। কোথাও এক দলীয় শাসন থাকায় আন্দোলন নিজস্ব নামে কাজ করতে না পারলেও বিরাট কর্মসূচী নিয়ে কর্মব্যস্ত রয়েছে। কোথাও ডানপন্থী এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মাঝখানে ইসলামী দল হিসেবে রাজনৈতিক ময়দানেও তৎপর। কোন্ কোন্ দেশে কিছুটা গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলন রাজনৈতিক দল হিসেবে কর্মরত নয়– যদিও রাজনৈতিক বিষয়ে আন্দোলনের সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়। কোন কোন দেশে সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলছে। মোট কথা প্রত্যেক দেশের ইসলামী আন্দোলন নিজস্ব পরিবেশ, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদিকে সামনে রেখেই তাদের কর্মসূচী, কর্মনীতি ও স্ট্রাটেজী নির্ধারণ করে।

ইসলামী আন্দোলনের এতসব বিভিন্ন রকম কর্মসূচী সাধারণতঃ মুসলিম প্রধান দেশেই লক্ষ্য করা যায়। ঐসব দেশেই ইসলামকে একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে

কায়েমের চিন্তা করা স্বাভাবিক। যেসব দেশে মুসলিম জনতার সংখ্যা নগণ্য সেখানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী আরও বিভিন্ন। সেখানে ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিজয়ী করার কর্মসূচী অনেক পরে সম্ভব হতে পারে। ভারতের মতো মুসলিম সংখ্যালঘু দেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী কোন মুসলিম প্রধান দেশের উপযোগী হতে পারে না।

বর্তমানে ইসলামী আন্দোলন যে কটি দেশে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে ইরান, পাকিস্তান, মিসর, সুদান ও তুরস্ক অন্যান্য দেশের তুলনায় অগ্রসর।

তুরস্কে ইসলামী আন্দোলন তেমন শক্তিশালী না হলেও মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের তুলনায় সেখানে গণতন্ত্র কিছুটা অগ্রসর বলে ইসলামী শক্তি সংগঠিত হতে বেশী সক্ষম। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে প্রধানতঃ ইসলামকে দমিয়ে রাখার প্রয়োজনেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এত ব্যাপক। যেসব মুসলিম দেশে বাদ্শাহী চলছে সেখানকার অবস্থা পৃথক। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোতে গণতন্ত্রের আওয়াজ সরকারীভাবে উচ্চারণ করা সত্ত্বেও নানা প্রকার ভাওতা দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। কারণ গণতন্ত্রের বিকাশ হলেই সেখানে ইসলামের বিজয় হবে বলে তাদের আশংকা।

আফগানিস্তানে ইসলামী আন্দোলন উপরোক্ত কয়েকটি দেশের তুলনায় তেমন সুসংগঠিত ও বলিষ্ঠ ছিল না। তবে ঐতিহাসিক কারণে সেখানে জিহাদী ঐতিহ্যের বিরাট প্রভাব রয়েছে। কিন্তু উলামাদের ও ইসলামী সংগঠন সমূহের মধ্যে ঐক্য না থাকায় রাশিয়ার দালালদের সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়া আফগানিস্থান দখল করে নেয়। ৭টি ছোট বড় ইসলামী দল পাকিস্তানে আশ্রয় নেয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১০ বছর যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বিজয়ের পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী হুকুমত কায়েমের মহান সুযোগ পেয়েও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। তাদের ব্যর্থতার এক পর্যায়ে তালেবান সরকার কায়েম হয় সৌদী মুজাহিদ উসামা-বিন-লাদেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের সাথে মিলে নিজেও যুদ্ধ করেছেন এবং বিরাট আর্থিক সাহায্যও দিয়েছেন। তালেবান সরকারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তিনি আফগানিস্থানেই অবস্থান করেন।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বিন লাদেনকে কোন তদন্ত ও প্রমাণ ছাড়াই দোষী সাব্যস্থ করে তাকে আফগানিস্থান থেকে বহিস্কার করার দাবী জানান। এ দাবী মানতে অস্বীকার করার অজুহাতে আমেরিকা আফগানিস্থান দখল করে তাদের পুতুল সরকার কায়েম করে। ইসলামী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ থাকলে এ দুর্দশা হতোনা।

ইউরোপে অবস্থানরত বিদেশী মুসলমানদের মধ্যে যারা ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্কিত তারা ঐ সব অনৈসলামী পরিবেশে নিজেদেরকে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তুলবার প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে সংগঠন কায়েম করে দ্বীনের দাওয়াত ব্যাপক করার চেষ্টা করেছেন। ভাষার পার্থক্যের দরুণ বিভিন্ন ভাষাভাষীদের আলাদা প্রতিষ্ঠান থাকলেও ইসলামী কাউন্সিল অব ইউরোপের মাধ্যমে সকল ভাষার মুসলমানদের মধ্যে সন্তোষজনক সমন্বয় রয়েছে এবং সময় সময় ঐক্যবদ্ধ হয়েও দাওয়াতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেন।

আমেরিকা ও কানাডায় এ উদ্দেশ্যে ইসলামী সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা নামে একটি বিরাট সংগঠনে বিদেশী সব মুসলমান ছাত্র ও অছাত্র শামিল হয়ে ইসলামের উল্লেখযোগ্য খেদমত করেছেন। আমেরিকার স্থানীয় কৃষ্ণকায় মুসলমানদের একাধিক সংগঠন সেখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার দাওয়াত দিচ্ছে।

ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি

এ কথা সত্য যে, প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুযায়ী সে দেশে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচী রচিত হয়। কিন্তু আন্দোলনের মূল কর্মপদ্ধতি সর্বদেশে সর্বকালে একই। এটা এমন স্থায়ী কর্মপদ্ধতি যা আল্লাহর নবী ও রাসূলগণকে পর্যন্ত অনুসরণ করতে হয়েছে। দুনিয়ায় যে কোন আদর্শ কায়েমের এটাই একমাত্র স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ-

এক ঃ আদর্শ যতই নিখুঁত হোক কোন আদর্শ নিজে নিজে সমাজে কায়েম হতে পারে না। এমন একদল নেতা ও কর্মী বাহিনী তৈরী হওয়া প্রয়োজন যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে ঐ আদর্শ বাস্তবে কায়েম করার যোগ্য।

দুই ঃ এ ধরনের যোগ্য নেতা ও কর্মীদল আসমান থেকে নাযিল হয় না। মানব সমাজ থেকেই এদেরকে সংগঠিত করে গড়ে তুলতে হয়। আদর্শের আন্দোলন যখন মানুষের নিকট তার দাওয়াত দিতে থাকে তখন সমাজে ঐ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হবার উপযোগী লোকেরা এগিয়ে আসে। আন্দোলনের পরিচালকগণ তাদেরকে সুসংগঠিত করে এক বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের মন, মগজ ও চরিত্র ঐ আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলেন।

তিন ঃ প্রত্যেক সমাজেই যেহেতু কোন না কোন বিধান প্রচলিত থাকে এবং সমাজপতিরা (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব) সে ব্যবস্থা চালু রাখার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ কায়েম রাখে, সেহেতু নতুন আদর্শের আন্দোলনকে তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কায়েমী স্বার্থের এ সংঘর্ষ প্রত্যেক নবীর জীবনেই দেখা গেছে। এ সংঘর্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জরুরী। এ সংঘাতই কর্মীদের জন্য সত্যিকার পরীক্ষা। সমাজের সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত হয়েও এবং কায়েমী স্বার্থের জেল, জুলুম ও নির্যাতন বরদাশত করেও যারা

আন্দোলনে টিকে থাকে তারাই এ আদর্শের যোগ্য বলে প্রমাণিত। এ স্বাভাবিক পরীক্ষা ছাড়া যোগ্য লোক বাছাই করার অন্য কোন উপায় নেই।

চার ঃ আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী তৈরীর এ চিরন্তন পদ্ধতি অবশ্যই সময় সাপেক্ষ। হঠাৎ অল্প সময়ে এটা কিছুতেই হতে পারে না। তাই বিশ্ব নবীকে দীর্ঘ ১৩টি বছর ব্যক্তি গঠন পর্যায়ে মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। নবীর কর্মীবাহিনীকে শেষ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল হিজরতের মাধ্যমে। ইসলামের খাতিরে এমনভাবে যারা বাধ্য হয়ে বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা প্রমাণ দিলেন যে, তাঁদের হাতেই দ্বীন ইসলামের বিজয় সম্ভব। কারণ দুনিয়ার সব কিছুই একমাত্র আদর্শের জন্য তারা ত্যাগ করতে পারেন। এভাবে আন্দোলনের মারফতে একদল ত্যাগী ও নিঃসার্থ কর্মীদল সৃষ্টি করতে বেশ কিছু সময় লাগা স্বাভাবিক।

পাঁচ ঃ ব্যক্তি গঠনের এ পর্যায় অতিক্রম করার পরই সমাজ গঠনের সুযোগ হতে পারে। ব্যক্তি গঠনের স্তরকে সংগ্রাম যুগও বলা যায়। সংগ্রাম যুগে তৈরী লোকদের হাতে কোথাও ক্ষমতা অর্পিত হলে আন্দোলনের বিজয় যুগ শুরু হয় এবং তখনি সমাজ গঠন সম্ভব হয়। হিজরতের পর মদীনায় এ সুযোগই রাসূল (সঃ) পেয়েছিলেন।

আদর্শ কায়েমের যোগ্য লোকের হাতে যে পর্যন্ত দেশের নেতৃত্ব না আসে সে পর্যন্ত আদর্শ বাস্তবে কায়েম হতে পারে না। যারা ইসলামকে জানে না বা জানলেও নিজেদের জীবনে মানে না তাদের দ্বারা কি করে ইসলাম কায়েম হতে পারে? যারা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম কায়েমে ব্যর্থ তারা সমাজে ইসলামের খেদমতের যোগ্যতাই রাখে না।

ছয় ঃ ইসলামের খেদমত ও ইসলামী আন্দোলনে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সাথে প্রচলিত ক্ষমতাসীন ও কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু ইসলামের যেসব খেদমত সম্পর্কে কায়েমী স্বার্থ বিচলিত নয় সে সবের সংগে তাদের সংঘাত হয় না। ইসলামের ঐসব খেদমত পরোক্ষভাবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক হতে পারে। কিন্তু ঐ খেদমতসমূহ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে দিতে পারে বলে আশংকা না করলে কায়েমী স্বার্থ তাদেরকে বাধা দেয় না। যদি কোন দাওয়াত ও কর্মসূচী সম্পর্কে কায়েমী স্বার্থের ধারণা হয় যে, তা দ্বারা তাদের পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনশক্তি গড়ে উঠবে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা আন্দোলনকে বরদাশত করবে না।

সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন প্রকৃতিগতভাবেই বিপ্লবাত্মক। আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল (সঃ) এর নেতৃত্বের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গঠন করার বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচীই নবীদের প্রধান সুন্নত। আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যহীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনই ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য। এ

আন্দোলনকেই কোরআন পাকের ভাষায় জিহাদ কি সাবীলিল্লাহ বলা হয়।

সাত ঃ ইসলামী আন্দোলন সঠিক কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রাম যুগ অতিক্রম করা সত্ত্বেও এবং ইসলাম কায়েমের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীদল সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত বিজয় যুগ না-ও আসতে পারে। অবশ্যই ঈমানদার ও সৎকর্মশীল এক জামায়াত লোক তৈরী হলে ইসলামের বিজয়ের প্রথম শর্ত পূরণ হয়। কিন্তু যে সমাজে ইসলামী বিধান কায়েমের চেষ্টা চলে সে সমাজের বৃহত্তর জনসংখ্যা যদি সে আদর্শের সক্রিয় বিরোধী হয় তাহলে বিজয় সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তৈরী যে নেতৃত্ব ও কর্মীদল মদীনায় ইসলাম কায়েম করতে সক্ষম হলেন তাঁরা মক্কায় কেন অক্ষম হলেন? এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম বিরোধী জনতার উপর ইসলাম কায়েম করা যায় না।

আল্লাহর অনেক রাসূল এ কারণেই দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করতে পারেননি। এটা তাঁদের ব্যর্থতা নয়। তাঁদের চেয়ে যোগ্য কে হতে পারে? দ্বীন ইসলাম কায়েমের দ্বিতীয় শর্ত হলো জনগণের কমপক্ষে পরোক্ষ সমর্থন। প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী জনসমষ্টির উপর ইসলাম কায়েম হতে পারে না। মক্কায় দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ হয়নি বলেই মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে।

আট ঃ এ কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলামী আন্দোলনের কাজ হলো প্রথমশর্ত পূরণের চেষ্টা করা–অর্থাৎ বাতিল শক্তির সাথে মোকাবিলা করার জন্য সমাজের মধ্য থেকে একদল বিপ্লবী মুজাহিদ তৈরী করা। যদি এ শর্ত পূরণ হয় এবং দ্বিতীয় শর্তও উপস্থিত থাকে তাহলে ঐ মুজাহিদ দলকে নেতৃত্ব দান করার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজ হাতে রেখেছেন। কিভাবে কি পন্থায় কখন তিনি নেতৃত্ব দান করবেন তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। নেতৃত্ব দান করার দায়িত্ব আল্লাহরই। কোন অস্বাভাবিক ও কুটিল পন্থায় নেতৃত্ব হাসিল করার চেষ্টা ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা হতে পারে না।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ - النور- ٥٥

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে দুনিয়ার খেলাফত দান করার ওয়াদা আল্লাহ করেছেন। (নূর–৫৫)

উপরোক্ত কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ না করে কোন না কোন প্রকারে ক্ষমতা হাসিল করলে যদি ইসলামকে কায়েম করার উদ্দেশ্য সফল হতো তাহলে যখন রাসূল (সঃ)-কে মক্কার নেতারা ইসলামের দাওয়াত পরিত্যাগ করে বাদশাহী কবুল করার আহবান জানালেন তখন তিনি ক্ষমতা হাতে নিয়ে কায়দা করে ইসলাম কায়েমের কথা নিশ্চয়ই বিবেচনা করতেন। একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে নতুন কোন ব্যবস্থা চালু করতে হলে ঐ সমাজ থেকেই নতুন আদর্শ কায়েমের উপযোগী একদল নিঃস্বার্থ লোক তৈরী করতে হবে।

আরও মজার ব্যাপার এই যে, এ ধরনের লোক অনৈসলামী সমাজে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। কারণ পার্থিব কোন স্বার্থের টানে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসা অস্বাভাবিক। যারা কায়েমী স্বার্থের বাধা ও যুলুমকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসে তারাই নতুন আদর্শের উপযোগী। সংগ্রাম যুগেই এ ধরনের লোক বাছই করা সম্ভব। বিজয় যুগে সুবিধাবাদী লোকও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তখন নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী লোক বাছাই করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্যই বিজয়ের পর আদর্শিক আন্দোলন ক্রমে স্বর্থপরদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব

দ্বীনের যত রকম খেদমত হচ্ছে তা দ্বারা আমাদের দেশে ইসলামের প্রচার বা ইশায়াতের কাজ হচ্ছে। কিন্তু শুধু ইশায়াত বা প্রচারের কাজ দ্বারা দ্বীন কায়েম হতে পারে না। ইকামাতে দ্বীন বা দ্বীন ইসলামের বিধানকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম করা বা বাস্তবে চালু করার জন্য ইশায়াতই যথেষ্ট নয়।

আল্লাহর দ্বীন যত বিশুদ্ধ ও মহান হোক না কেন সে দ্বীন মানুষের চেষ্টা ছাড়া আপনিতেই কায়েম হয়ে যাবে না। তাই আল্লাহ্ পাক দ্বীন ইসলামকে কায়েম করার জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। কোন নবী বা রাসূল একাই দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন নি। তাই তারা মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন তাদের সাথী হবার জন্য। অনেক নবী প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকর্মী না পাওয়ায় দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেননি। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইকামতে দ্বীনের জন্য। সংঘবদ্ধ চেষ্টা বিশেষভাবে জরুরী। যারা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী দেখতে চান তাদের সংখ্যা বিরাট হলেও তাদের মজবুত সংগঠন ও সুপরিকল্পিত চেষ্টা ছাড়া এ বিজয় কখনও সম্ভবপর হতে পারে না।

নবী করীম (সঃ)-এর উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। শুধু দ্বীনের ইশা'য়াত পর্যন্তই তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। ইশায়াত ব্যতীত ইকামাত হতে পারে না সত্য কিন্তু শুধু ইশা'য়াত দ্বারা আপনিই দ্বীন কায়েম হতে পারে না।

আল্লাহ্ পাক তাঁর শেষ নবী (সঃ)-কে দুনিয়ায় পাঠাবার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে কোরআনে প্রকাশ করেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ (التوب ٣٣ ـ الفتح ٢٨ ـ الصف ٩)

তিনিই সে (সত্তা) যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও একমাত্র সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি (সে দ্বীনকে) অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। (ফাতাহ্-২৮)।

বিশ্বনবী এ মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলেই দুনিয়ায় আল্লাহর রচিত জীবন বিধান মানব জাতির জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

মদীনার একটি ছোট্ট এলাকায় দ্বীনের বাস্তব রূপায়ণ হওয়ার কারণেই আরববাসীদের পক্ষে এর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। বাস্তব জীবনে দ্বীন ইসলাম কায়েম হবার সুফল আরবের সর্বত্র মানুষকে দলে দলে ইসলাম কবুল করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বিশ্বনবী ইকামাতে দ্বীনের (দ্বীন-ইসলামকে কায়েম করার) যে পবিত্র দায়িত্ব পালন করে গেছেন সে কাজটাই তাঁর সবচেয়ে বড় সুন্নাত। নবীর উম্মতের উপর এ সুন্নাতের অনুসরণই সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এ কর্তব্যকে অবহেলা করে অন্য যত প্রকারেই দ্বীনের খেদমত করা হোক তাতে ইসলামের বিজয় সম্ভব হতে পারে না। ব্যক্তি জীবনে যত দ্বীনদার হবারই চেষ্টা করা হোক তাতে ইসলামের দাবী পূরণ করা যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামকে কায়েম করা ছাড়া উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব পালন করা হয় না ।

ইতিপূর্বে যে নয় প্রকার দ্বীনী খেদমতের কথা আলোচনা করা হয়েছে এর মধ্যে সবগুলো সত্যিকার অর্থে সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠলে দ্বীনের আর ও বেশী খেদমত হতো। সংগঠন হিসেবে গণ্য হতে হলে কয়েকটি জরুরী শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন। কোন একটি নিদির্ষ্ট দ্বীনী লক্ষ্য হাসিল করার জন্য দাওয়াত দেয়া; যারা দাওয়াত কবুল করেন তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের ব্যক্তি চরিত্র গঠন করা; কর্মীদের জন্য নিয়মিত কর্মসূচী থাকা; সে কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য দায়িত্বশীল থাকা এবং দায়িত্বশীলদের নির্দেশ পালন করার জন্য কর্মী বাহিনী থাকা ইত্যাদি সংগঠনের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। এ জাতীয় সাংগঠনিক পন্থায় ইকামাতে দ্বীনের বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের প্রচেষ্টায়ই ইসলামের বিজয় সম্ভব। পূর্ব বর্ণিত নয়টি খেদমতের মধ্যে যে কয়টি সংগঠনের পর্যায়ে পড়ে তাদের দাওয়াত ও কর্মসূচীকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার যে এর কোন্ কোন্টা ইকমাতে দ্বীনকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

তাবলীগ জামায়াতের ভাইদের ধারণা যে ব্যক্তি চরিত্র ইসলাম মোতাবেক গঠন হতে থাকলে এর পরিণামে ইসলামের বিজয় আপনিতেই হবে। এ ধারণা বাস্তবে ঠিক বলে যাদের মনে হয় তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করার জন্য যারা তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচীকে যথেষ্ট মনে করেন না তাঁদেরকে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ও কর্মসূচীকে ভালভাবে বুঝবার জন্য অনুরোধ জানাই।

ইকমাতে দ্বীনের জন্য চেষ্টা করা যদি ঈমানের দাবী হয় তাহলে কোন না কোন জামায়াত বা সংগঠনের সাথে মিলেই কাজ করতে হবে। একা কোন নবীর পক্ষেও এ বিরাট কাজ করা সম্ভব হয়নি। যদি কেউ এমন যোগ্য হন যে প্রচলিত সব জামায়াতেরই দোষ-ত্রুটি বুঝতে তিনি সক্ষম, তাহলে এসবের চেয়ে ভাল কোন জামায়াত গঠন করুন। শুধু অন্যের দোষ দেখে বা অন্য জামায়াতের সমালোচনা করা দ্বারাই তো ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করা হয়ে যাবে না।

আল্লাহর দ্বীনকে তাঁর রাসূলের শেখান কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী দুনিয়ায় কায়েম করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এক জামায়াতে শামিল হয়ে কাজ করছি। এ মহান উদ্দেশ্য এর চেয়ে ভাল, বলিষ্ঠ ও রাসূলের অধিকতর অনুসারী কোন জামায়াত আছে বলে আমার জানা নেই। কোন অবস্থায় জামায়াত বিহীন জীবন যাপন করা ইসলাম সম্মত মনে করি না, যে জামায়াতে কাজ করছি রাসূলের (সঃ) পরিচালিত জামায়াতের গুণাবলীর দ্বারা তাকে আর ও সজ্জিত এবং উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এর চেয়ে অধিক উন্নত জামায়াত পেলে এ জামায়াত ছেড়ে ঐ জামায়াতে যাওয়া কর্তব্য মনে করব।

রাসূল (সঃ) যে জামায়াত গঠন করেছিলেন সে জামায়াতই ছিল আল জামায়াত" বা একমাত্র দ্বীনী জামায়াত। ঐ জামায়াতে যারা শামিল ছিলেন তাঁরাই মুসলিম ছিলেন। ঐ জামায়াতের বাইরে থাকলে কেউ মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারত না। কিন্তু বর্তমানে কোন একটি জামায়াত আল-জামায়াত" হিসেবে গণ্য হতে পারে না। যে সব জামায়াত রাসূল (সঃ)-এর জামায়াতকে অনুসরণ করে চলে তাদের সবাইকে নিয়ে "আল-জামায়াত" গঠিত। বিচ্ছিন্নভাবে কোন একটি জামায়াত "আল জামায়াত" এর মর্যাদা দাবী করলে অন্যায় হবে। এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীন ইসলামের শিকল যে-ই গলায় পড়বে তাকে রাসূল (সঃ)-এর পথে চলতে হলে কোন না কোন জামায়াত ভুক্ত হতে হবে। তিনজন মুসলমান সফরে রওনা হলে সেখানে ও একজনকে আমীর নির্বাচিত করে জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। জামায়াতবিহীন জিন্দেগী যদি সফরে ও অনুচিত হয় তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় জামায়াতী জীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে। তাই প্রত্যেক মুসলিমকে জামায়াতবদ্ধভাবে আল্লাহর ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্য করা কর্তব্য। মুসলিম মাত্রই হয় আমীর (হুকুম কারী) বা মামুর (হুকুম পালনকারী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এ জন্যই হাদীসে জামায়াতের শৃংখলার উপর এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দ্বীনী হেদায়াত হাসিল করার সঠিক উপায়

আল্লাহ্ পাক মানব জাতির হেদায়াতের জন্য রাসূল ও নবী পাঠিয়েছেন। তাঁদের বাস্তব জীবনই মানুষের জন্য প্রকৃত আদর্শ। তাঁরা আল্লাহর রচিত জীবন বিধানকে বাস্তব জীবনে পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। শেষ নবীর নিকট কোরআন পাকের আকারে মানব জাতির জন্য যে হেদায়াত এসেছে তা যদি কেউ আন্তরিকভাবে অনুসরণ করতে চায় তাহলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পূর্ণরূপে অনুকরণ করতে হবে। আল্লাহ পাক তাঁকেই (اسوة حسنة) বা সুন্দরতম আদর্শ বলে কোরআনে ঘোষণা করেছেন। এমনকি হজরত ঈসা (আঃ) আবার যখন দুনিয়ায় আসবেন তখন তিনিও এ আদর্শকেই অনুসরণ করবেন। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির নিকট একমাত্র আদর্শ মানব তিনিই। কিয়ামতের দিন মানুষকে এ হিসাবই

দিতে হবে যে তারা রাসূলকে অনুসরণ করেছে কিনা। রাসূল ছাড়া আর কোন বুযর্গ অলি বা ইমামকে আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে হিসাব চাওয়া হবে না।

আমরা অবশ্যই দ্বীনের দাবী হিসেবে সাহাবায়ে কেরামকে (রাঃ) অনুকরণ যোগ্য মনে করি। এর কারণ এই যে আমরা তাঁদেরকে রাসূলের সত্যিকার অনুসারী বলে বিশ্বাস করি। এর অর্থ এই যে আমরা রাসূলের আনুগত্য করার জন্যই সাহাবায়ে কেরামকে (রাঃ) মানি। তাঁদেরকে অনুসরণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের কাছ থেকে রাসূলের আনুগত্য শেখাই উদ্দেশ্য। যারা কোন মাযহাবকে মানেন তাদের এ মানার একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো রাসূলের অনুসরণ। আমরা কোন পীর আলেম বা বুযর্গকেও রাসূলের আনুগত্য করার আশা নিয়েই মানি। সুতরাং আসল লক্ষ্য হলো আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ, এ কথা যদি আমাদের মন-মগজে সজাগ থাকে তাহলে কোন ব্যক্তিকে আমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করব না এবং তাঁর অভ্যাস, পোশাক, চালচলন ইত্যাদি অনুকরণ করা প্রয়োজন মনে করব না।

এ কথা অবশ্যই বাস্তব সত্য যে দ্বীনী জিন্দেগী যাপন করতে হলে কোন জামায়াত বা ব্যক্তির সহায়তা অবশ্যই জরুরী। সাধারণ লোকের তো কথাই নেই আলেম হলেও বহু দ্বীনী বিষয়ে এমন সব লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া দরকার হয় যাঁদের ইলম ও আমলের উপর আস্থা স্থাপন করা যায়। দ্বীনের ব্যাপারে যার কাছ থেকে হেদায়াত ও পরামর্শ পাওয়া যায় তিনি আলেম, শায়েখ, পীর ইত্যাদি যে নামেই পরিচিত হন তাতে কিছু আসে যায় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে তাঁর নিকট কি নিয়তে যাচ্ছি। যদি এ নিয়ত হয় যে "অমুক ব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালা লোক-তিনি যা বলেন বা করেন তাই আমার গ্রহণ করতে হবে" তাহলে এটা ইসলামের নীতির বিরোধী হবে। যার কাছেই যাই একমাত্র রাসূলের অনুসরণের নিয়তেই যেতে হবে। তাহলে সজাগ দৃষ্টি থাকবে যে রাসূলের জীবন তিনি যতটুকুই অনুসরণ করছেন বলে বুঝা যায় ততটুকুই তাঁকে মানবো।

এ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই আমাদের মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হচ্ছে। যারা মাদরাসায় দ্বীন শিক্ষা করছেন তারা উস্তাদদেরকে যদি পূর্ণ আদর্শ মনে করে বসেন তাহলে দ্বীনের অন্যান্য খেদমতকে কোন গুরুত্বই দেবেন না। যারা তাবলীগ জামায়াতের কাজকে রাসূলের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মনে করবেন তাদের নিকট দ্বীনের অন্যান্য কাজ একেবারেই বেকার মনে হবে। পীরের কাছে যেটুকু শিক্ষা পাওয়া গেল সেটুকুকেই দ্বীনের সবকিছু মনে করলে আর সব দ্বীনের কাজকে তুচ্ছ মনে করা হবে।

যারা যেখানে যতটুকু দ্বীনের কাজ করছেন, সেখানে রাসূলের যে পরিমাণ অনুসরণ হচ্ছে সেটাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু দ্বীনের দাবী কতটা তা জানতে হবে রাসূলের জীবন থেকে এবং যেখানে রাসূলের যতটুকু শিক্ষা পাওয়া যায় সেটুকুই নিতে হবে। রাসূলের পূর্ণ অনুসরণ কোন এক ব্যক্তি করেছেন মনে করে যদি তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করা হয় তাহলে তার জীবনে ইসলাম

অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। কারণ কোন ব্যক্তিই রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করতে সক্ষম নন। এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে রাসূলকে যে যতটুকু অনুসরণ করছেন ততটুকুর জন্য তিনি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে দ্বীনের খাদেমগণের সবার মধ্যেই রাসূলের আদর্শ কিছু অবশ্যই পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে কারো মধ্যে যেটুকু অভাব দেখা যাবে সেটুকুর জন্য তাঁর সমালোচানা ও গীবত না করে সেক্ষেত্রে অন্যের কাছে রাসূলের বাকী আদর্শ তালাশ করতে হবে। যদি আমরা এ নিয়মে দ্বীনী হেদায়াত হাসিলের চেষ্টা করি তাহলে দ্বীনের যত রকম খেদমত হচ্ছে এবং যত জামায়াত দ্বীনের কাজ করছে সবাইকে জানার চেষ্টা করা প্রয়োজন মনে হবে। রাসূলের আদর্শ তালাশ করার জন্য অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সবাইকে বিচার করার যোগ্যতাও হবে এবং যেখানে যতটুকু দ্বীনের শিক্ষা পাওয়া যাবে সেটুকু গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে ইসলামকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করা সম্ভব ও সহজ হবে। তা না হলে ইসলামের কোন এক বা একাধিক অংশকেই সম্পূর্ণ ইসলাম মনে করে আখেরাতের বড় মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের পরিচিতি

১৯৭১ সাল থেকে যে ভূখন্ডটি 'বাংলাদেশ' নামে পৃথিবীর মানচিত্রে আসন লাভ করেছে সে এলাকাটি ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ নাম ধারণ করে তদানীন্ত ভারত উপমহাদেশ থেকে আলাদা হবার পর থেকে বিপুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত হয়। শতকরা ৮৫ জন মুসলামনের বাসস্থান হিসেবে এ দেশটি বর্তমানে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।

ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪১ সালে লাহোর শহরে জামায়াতে ইসলামী নামে যে বিপ্লবী ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয় তাঁর ঢেউ ১৯৪৭ সাল পর্যন্তও এদেশে পৌছেনি। ভারত বিভাগের পরে বিহার ও ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে যেসব মুসলমান এদেশে আসেন তাদের মধ্যে অল্প কিছু লোক ঐ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। তারা উর্দুভাষী ছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের যে সামান্য পরিমাণ সাহিত্য এ দেশে পৌছে তাও উর্দু ভাষায় ছিল। তখন এদেশে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমই একমাত্র বাংলাভাষী ছিলেন যিনি জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। কিন্তু তখনও প্রদেশভিত্তিক কোন সংগঠন কায়েম হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাওলানা রফী আহমদ ইন্দোরীকে ১৯৪৮ সালের মে মাসে ঢাকা পাঠান হয়। ঐ মাসেই সর্বপ্রথম ঢাকায় ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডে প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর অফিস কায়েম করা হয় এবং চারজন সদস্য সমন্বয়ে স্থানীয় জামায়াত গঠন করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম সাহেব তখন বরিশালের এক মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। সেখান হতে তাঁকে জামায়াতের সাহিত্যকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য ঐ মাসেই ঢাকায় আনা হয়। ১৯৫১ সালে মাওলানা রফী আহমদ ইন্দোরী লাহোর ফিরে গেলে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের উপর প্রাদেশিক জামায়াতের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং

১৯৫৩ সালে চৌধুরী আলী আহমদ খান এ দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তা পালন করেন।

মাওলানা ইন্দোরী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে ঢাকায় প্রেরিত হবার পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতের প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলে সম্ভব হয়নি। তাই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং কেন্দ্রীয় জামায়াত। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের উদ্যোগ ব্যতীত স্থানীয়ভাবে এ অঞ্চলে জামায়াতের সংগঠন সম্ভব হয়নি বলেই মাওলানা রফী সাহেবকে কেন্দ্র থেকে পাঠাতে হয়েছিল। আর ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করলে মাওলানা রফীকেই এখানে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে।

মাওলানা রফী আহমদ ইন্দোরী এদেশের আলেমগণকে উর্দু ভাষায় রচিত জামায়াতের সাহিত্যের সাথে পরিচিত করার চেষ্টা করেন। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর ৬ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল এ দেশে সফর করায় সর্বপ্রথম জেলা শহরগুলোর কিছু লোক জামায়াতে বিপ্লবী দাওয়াতের সামান্য পরিচয় লাভ করলেও সংগঠনের অভাবে সত্যিকারভাবে তখনও কাজ শুরু হয়নি।

উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যতম চৌধুরী আলী আহমদ খান মরহুম ১৯৫৩ সালেই এদেশে জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাংগঠনিক কাঠামো কিছুটা মজবুত হবার পরই মাওলানা মওদুদীকে আনিয়ে এ দেশবাসীর নিকট ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করার ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর্যন্ত জেলে আটক থাকায় ১৯৫৬ সালের পূর্বে এ বিরাট ইসলামী চিন্তানায়কের এ দেশে আসা সম্ভবপর হয়নি।

১৯৫৬ সালের প্রথম ভাগে সর্বপ্রথম তিনি এদেশে ৪০ দিন ব্যাপক সফর করে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত জনগণের নিকট পেশ করেন। প্রতিটি জনসভা ও সুধী সমাবেশে তিনি ইসলামী আন্দোলনের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে হলেও পেশ করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ তখন আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালের শাননতন্ত্র বর্জন করার আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করায় মাওলানা মওদুদীকেও মন্দের ভাল হিসেবে ঐ শাসনতন্ত্রের পক্ষে কথা বলতে হয়। ইসলামী ও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দীর্ঘ সংগ্রামের পর ঐ শাসনতন্ত্রের গণদাবী যতটুকু স্বীকার করা হয়েছে তা মেনে নিয়ে শাসনতন্ত্রহীন অবস্থার অবসান ঘটিয়ে ক্রমে দেশকে আরও অগ্রসর করার আহবানই তিনি জানালেন। ফলে তাঁর ঐ প্রথম সফরটি বাস্তবে রাজনৈতিক সফরে পরিণত হয় এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াত ঐ পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই গৌণ হয়ে পড়ে।

জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত অর্থে কোন কালেই নিছক 'রাজনৈতিক' দল ছিল না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সর্বক্ষেত্রে ইসলামী জীবন বিধানকে কায়েমের আন্দোলনই জামায়াতের লক্ষ্য। ফলে দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন থেকে আলাদা হয়ে থাকা জামায়াতের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে

যখন এ দেশে জামায়াতে ইসলামী প্রসার লাভ করা শুরু করে তখন থেকে এমন সব রাজনৈতিক মত ও পথ দেশকে দোলা দিতে থাকে যে জামায়াত তার বুনিয়াদী ইসলামী দাওয়াত ও কর্মসূচীকে জনগণের নিকট পেশ করার জন্য কোন সুস্থির পরিবেশ পায়নি। রাজনৈতিক ইস্যুতে জামায়াতের যে বক্তব্য সেটাকেই বড় করে দেখা হয়েছে এবং জামায়াতের মূল দাওয়াত নিরেপক্ষ মনে বিবেচনার সুযোগ কমই হয়েছে। মাওলানা মওদুদী যতবার এদেশে সফর করেছেন ততবারই কোন না কোন রাজনৈতিক ইস্যু গোটা পরিবেশকে অশান্ত করে রাখায় তিনি এ দেশে প্রধানতঃ একজন রাজনীতিবিদ হিসেবেই পরিচিত হয়ে গেলেন। বর্তমান দুনিয়ায় এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি সকল দেশে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে যে বিরাট শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন, তাঁর সে মহান পরিচিতি থেকে এ দেশ এখনও বঞ্চিত রয়েছে। এ দেশের ইসলাম প্রিয় কোটি কোটি মানুষের জন্য এটা খুবই দুঃখজনক দুর্ঘটনা। এ কারণেই বাংলাদেশের সুধী ও বৃহত্তর জনসমাজে ইসলামী আন্দোলন সঠিকরূপে পরিচিত হতে সময় লেগে গেছে।

জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ও কর্মসূচী

জামায়াতের তিন দফা দাওয়াতঃ– জামায়াতে ইসলামী মানুষকে কোন নতুন বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেয় না। আবহমান কাল থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণ মহান প্রতিপালকের দাসত্ব করার যে চিরন্তন দাওয়াত দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামী সে দাওয়াতই দেয়। নবীগণের দাওয়াতে যারা সাড়া দিয়েছেন তাদের জীবনকে শিরক ও পঙ্কিলতা থেকে তাঁরা পাক করেছেন। যখন প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য সাথী যোগাড় হয়েছে তখন সমাজ থেকে খোদাদ্রোহী ও অসৎ লোকের নেতৃত্ব খতম করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাদের দ্বারা আল্লাহর আইন চালু করেছেন। নবীদের ঐ দাওয়াত ও কার্যক্রমকেই জামায়াতে ইসলামী সুস্পষ্ট ভাষায় তিনটি দফায় পেশ করে থাকে।

সাধারণত ঃ সকল মানুষের নিকট এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের নিকট জামায়াতে ইসলামী নিম্নরূপ দাওয়াত দেয় ঃ

এক ঃ দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করুন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে একমাত্র মনিব ও তাঁর রাসূল (সঃ) কে অনুকরণযোগ্য একমাত্র আদর্শ মানব মেনে নিন।

দুই ঃ আপনি সত্যিই ইসলামের দাবীদার হলে আপনার বাস্তব জীবন থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা, কাজ, অভ্যাস ও যাবতীয় মুনাফেকী দূর করুন।

তিন ঃ খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবন-যাপন করতে চাইলে জামায়াত বদ্ধভাবে চেষ্টা করুন যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ঈমানদার, খোদাভীরু চরিত্রবান ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েম হয় এবং অসৎ, খোদাদ্রোহী ও খোদা বিমুখ নেতৃত্ব খতম হয়।

জামায়াতের চার দফা কর্মসূচী ঃ জামায়াতে ইসলামী একটি বিজ্ঞান সম্মত বিপ্লবী আন্দোলন। জামায়াত হৈ-হাংগামার মাধ্যমে বিপ্লব সাধন করতে চায় না। স্থায়ী, ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য প্রথমে মানুষের চিন্তাধারাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হবে। চিন্তা শক্তিই মানুষের পরিচালক। যারা চিন্তার ক্ষেত্রে ঐক্যমতে পৌছে তাদেরকে সুসংগঠিত করে আন্দোলনের যোগ্য নেতা ও কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে সমাজের খেদমতে নিযুক্ত করে সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সমাধান পেশ করার যোগ্য নিঃস্বার্থ খাদেমরূপে তৈরী করতে হবে। এরপর যখনই আল্লাহ পাক সুযোগ দেন তখন জন সমর্থন নিয়ে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। এ সব কর্মধারাকে জামায়াত চারটি দফায় নিম্নরূপ ভাষায় প্রকাশ করে ঃ

১। দাওয়াত ও তাবলীগ-ইসলাম প্রচার ও আল্লাহর দিকে আহবান ঃ

(ক) কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা গড়ে তুলবার ব্যাপক আন্দোলন চালানো।

(খ) আধুনিক গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফসলকে ইসলামের কষ্টি পাথরে যাচাই করে গ্রহণ ও বর্জনের নীতি চালু করা। অন্ধভাবে সবই গ্রহণ বা সবই ঘৃণাভরে বর্জন না করে জ্ঞান, যুক্তি ও কল্যাণের দৃষ্টিতে বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করা।

(গ) বর্তমান যুগের যাবতীয় সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করে প্রচলিত অন্যান্য মতবাদের ভুল ধরিয়ে দেয়া।

এ তিন ধরনের কাজের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের জ্ঞান–বিতরণ ও সে জ্ঞান ভিত্তিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দাওয়াতই জামায়াত দিয়ে থাকে।

২। তানযীম ও তারবীয়াত–সংগঠন ও প্রশিক্ষণ ঃ

(ক) ইসলামের প্রতি আগ্রহশীল, সমাজ সচেতন, সৎলোকের সন্ধান ও সংগঠন।

(খ) বাস্তবমুখী কার্যক্রমের মারফতে তাদেরকে আল্লাহর খাঁটি গোলাম ও দ্বীনের যোগ্য খাদেম বানাবার জন্য উপযোগী তারবিয়াত বা ট্রেনিং দান।

(গ) চরিত্রবান কর্মী বাহিনী তৈরি করে সমাজকে সৎ নেতৃত্ব দানের ব্যবস্থা করা।

৩। ইসলাহে মো'য়াশারা – সমাজ সংস্কার ঃ

(ক) সমাজ গঠন ও সমাজ সেবায় সকল রকম কাজের মাধ্যমে দেশকে এবং দেশবাসীকে উন্নত করার চেষ্টা।

(খ) সকল পেশা, শ্রেণী ও স্তরের লোকদেরকে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজ সচেতন করা ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক মনোভাব পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

(গ) জনগণকে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়োজিত করা।

৪। ইসলাহে হুকুমাত–সরকার ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ শাসন শৃংখলা, বৈদেশিক নীতি, আইন-কানুন, জনগণের নৈতিক-পার্থিব উন্নতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, উন্নয়নমূলক কাজ ও দেশের সঠিক উন্নতি সম্পর্কে ইসলামের আলোকে সরকারকে উপযুক্ত পরামর্শ দান করা।

(খ) খোদাদ্রোহী, ধর্ম নিরপেক্ষ, অসচ্চরিত্র নেতৃত্বের অপসারণ ব্যতীত সমাজের পূর্ণরূপ সংশোধন অসম্ভব। তাই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আরম্ভ করে সকল সরকারী দায়িত্ব থেকে এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অপসারণের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ নেতৃত্ব কায়েম করা।

(গ) যুক্তি ভিত্তিক রাজনীতির প্রচলন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ ও অস্ত্রের ব্যবহার রোধ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে একনায়কত্বের অবসান ঘটাবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণ আন্দোলন করা।

(ঘ) রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদেরকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকলস্তরের নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য লোককে বিজয়ী করার চেষ্টা করা। যেখানে জামায়াতে ইসলামীর তৈরী লোককে অন্যদের চেয়ে অধিকতর যোগ্য মনে করা হবে সেখানে তাকেই নির্বাচিত হবার সুযোগ দান করা।

এ কর্মসূচী সম্পর্কে বিশেষ বিবেচ্য

এ ৪ দফা কর্মসূচীর প্রত্যেকটি দফাই অপর সব কয়টির সহায়ক ও পরিপূরক। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এ ৪টি দফা অনুযায়ী অত্যন্ত সুবিবেচনার মধ্যে কাজ করে যেতে হবে-যাতে আন্দোলনের মূল লক্ষ্যের দিকে পরিপূর্ণ ভারসাম্য বজায় রেখে অগ্রগতি সম্ভব হয় । এ সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হবার কয়েকটি বছরের মধ্যে ব্যাপক সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ, চরম নৈতিক অধঃপতন, স্বার্থপর নেতৃত্ব, সুবিধাবাদী রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে দেশ এমন এক দুঃখজনক অবস্থায় পৌঁছেছে যে, ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যাতে চতুর্থ দফার কাজ যোগ্যতার সাথে করা সম্ভবপর হয়।

জামায়াতে ইসলামীর প্রকৃত পরিচয়

উপরোক্ত তিন দফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচী থেকে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে—

১। এ জামায়াত মূলতঃ একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। এর ব্যাপকতা ততটুকুই যতটুকু ইসলাম ব্যাপক। ইসলাম যেহেতু মানব জীবনের সব ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত, সেহেতু জামায়াতও ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী হিসেবে গোটা ইসলামকে কায়েম করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

২। এ জামায়াত স্বাভাবিক গতিতে সমাজ বিপ্লব সৃষ্টি করতে চায়। তাই এর কার্যক্রম তামুদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। সে হিসেবে জামায়াতকে প্রধানতঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলা যায়।

৩। জামায়াত রাজনীতি বর্জিত নিছক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়। বিশ্ব নবীর আন্দোলন যদি ধর্ম সর্বস্ব হতো তাহলে বাতিল রাজশক্তির সাথে তাঁর সংঘর্ষ হতো না বা মদীনায় তিনি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতেন না। জামায়াত ততটুকুই রাজনীতি করা ফরয মনে করে যতটুকু রাসূল (সঃ) করেছেন। তাই জামায়াত রাজনীতি প্রধান দল নয়। প্রত্যক্ষ রাজনীতি জামায়াতের চার দফা কর্মসূচীর চতুর্থ দফা মাত্র। অর্থাৎ জামায়াতের গোটা কার্যক্রমের এক চতুর্থাংশ মাত্র প্রত্যক্ষ রাজনীতি। আর সে রাজনীতিও একমাত্র ইসলামী নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লাগামহীন রাজনীতি, মিথ্যার রাজনীতি ও ধোঁকাবাজীর রাজনীতির সাথে জামায়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

৪। এ কথা অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ যে কালেমায়ে তাইয়্যেবাও রাজনীতি বর্জিত নয়। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই বলে কালেমায় যে প্রথম স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম হতে হয় সেটুকুতে কি রাজনীতি নেই? আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোন হুকুম পালন না করার ঘোষণাই কালেমায় রয়েছে। সুতরাং সঠিক মর্ম বুঝে কালেমা তাইয়্যেবাকে কবুল করা মানে অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা। তাই রাজনীতি শুরু থেকেই মুসলিম জীবনের অংশ। তবু জামায়াতে ইসলামীর কার্যসূচীতে সরাসরি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম ৪র্থ দফায়ই শুধু রয়েছে।

আমার দ্বীনী জিন্দেগী

সর্বশেষে আমার দ্বীনি জিন্দেগী সম্পর্কে এ পুস্তিকার পাঠকগণকে সামান্য একটু ধারণা দেবার চেষ্টা করছি যাতে আমার বক্তব্যকে উদার মনে গ্রহণ করা সহজ হয়।

আমার দাদা অধ্যবসায়ী আলেম ছিলেন। কোরআন শরীফ পড়া তার কাছ থেকেই শিখেছিলাম। কিন্তু আমি ৫ম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তার এন্তেকাল হওয়ায় তার সোহবত থেকে ফায়দা উঠাবার সৌভাগ্য হয়নি। আমার মরহুম আব্বা আলেম ও আধুনিক শিক্ষিত ছিলেন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসরণের উপর এত গুরুত্ব দিতেন যে, আমাদের কোন ভাইকেই ছাত্রজীবনেও দাড়ি পর্যন্ত কামাতে দেননি, যদিও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছিলাম।

আব্বারই তাগিদে ও অনুপ্রেরণায় ৭ম শ্রেণী থেকেই ইসলাম সম্বন্ধে বই-পুস্তক পড়ায় মনোযোগী হই। তখন থেকে মাসিক নেয়ামত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলাম। তাতে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাঃ) এর কোরআন হাদীস-ভিত্তিক বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ ওয়ায আমাকে এত অভিভূত করতো যে বাংলা ভাষায় থানভী (রাঃ)-এর সব বই যোগাড় করে পড়তাম। এভাবেই ছাত্রকাল থেকে মাওলানা

শামসুল হক ফরীদপুরী (রঃ)-এর সাথে এত মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

এম, এ ফাইনাল পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বে আমার আব্বারই নির্দেশে তাবলীগ জামায়াতে যোগদান করি। পরীক্ষার পর একটানা তিন চিল্লায় বেরিয়ে পড়ি এবং দিল্লীতে যেয়ে এক জামায়াতের সাথে এক চিল্লার বেশি সময় হিন্দুস্তানে কাটাই। রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে তমদ্দুন মজলিসের সাথে ঘনিষ্ঠ হই। তিন বছর একযোগেই তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসে কাজ করি। ইসলামের ধর্মীয় দিক এবং তমদ্দুন মজলিসে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক মিলিয়ে আমি পূর্ণ দ্বীন-ইসলাম সম্বন্ধে চর্চা করতাম।

তমদ্দুন মজলিসের মারফতেই সর্বপ্রথম আমি মাওলানা মওদূদীর (রঃ) কয়েকখানা বই বাংলা ও ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ পাই। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে সর্বপ্রথম গাইবান্ধায় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠক জনাব আবদুল খালেক মরহুমের নিকট থেকে জামায়াতের দাওয়াত পাই। তিনি জামায়াতের সংগঠনে আমাকে শামিল করে রংপুর শহর ও কলেজে জামায়াতের শাখা পরিচালনা শিক্ষা দেন। তিনি ১৯৭৯ সালে এন্তেকাল করা পর্যন্ত এদেশে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবার এক বছর পর ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক দিক সহ পূর্ণ দ্বীনের খেদমত এক সাথেই করার প্রেরণা নিয়ে চাকরী জীবন ছেড়ে ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করি। জামায়াতে ইসলামীর বিপুল সাহিত্য বিশেষ করে মাওলানা মওদূদীর বিপ্লবী তাফসীর তাফহীমুল কোরআন-অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে উর্দূভাষা শিখি। এভাবেই উর্দূভাষায় বিশাল ইসলামী সাহিত্যের নাগাল পাই।

দেশের বহু প্রসিদ্ধ আলেমের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ও মহব্বত থাকায় মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত ফাতোয়া ও পুস্তকাদি আমার হস্তগত হয়। আমি নিরপেক্ষ মন নিয়ে ঐ সব পড়েছি। এর ফলে আমার জ্ঞান বাড়ার সাথে সাথে মাওলানা মওদূদীর সমালোচকগণের যুক্তিগুলো বিবেচনা করার সুযোগও পেলাম! এতে আমার দুটো সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে ঃ

এক ঃ প্রথমত ঃ ওলামাদের সমালোচনার যেসব যুক্তি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে তার ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদীর সব কথা বিচার করেই আমি গ্রহণ করি। মাওলানা মওদূদী বলেছেন বলেই অন্ধভাবে কোন কথা গ্রহণ করি না।

দুই ঃ ওলামাদের মধ্যে যারা মাওলানার ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁদের ভাষা ও বলার ভংগী থেকে তাঁদের চিনতে সহজ হয়েছে যে, কে ইখলাসের সাথে সংশোধন চান এবং কে বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেন।

মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রঃ) ও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী

(রঃ)-এর দেখিয়ে দেয়া কোন কোন ভুল যে মাওলানা মওদূদী সংশোধন করেছেন সে কথা মাওলানা মওদূদী স্বয়ং আমাকে বলেছেন। এ জন্যই আমি প্রত্যেক হক-পরস্ত ও মুখলিস আলেমের নিকট সবিনয় দরখাস্ত করছি যে, আরব দুনিয়ার গোটা আলেম সমাজ তাঁকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। তার লেখা কিতাবাদি নিজেরা পড়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখুন। বিনা তাহকীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আলেমগণের শোভা পায় না। মাওলানা মওদূদীর সমালোচনা যে শ্রদ্ধেয় আমেলগণ করেছেন তাদের লেখা পড়ার পর তাঁরা মাওলানার যেসব বই-এর সমালোচনা করেছেন সে বইগুলো না পড়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া নিরাপদ নয়। কারণ সমালোচকগণেরও ইজতেহাদী ভুল হতে পারে। তাই নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করার আকুল আহবান জানাচ্ছি।

আমি কোন আলিয়া বা কওমী মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রী নেবার সুযোগ পাইনি বলে স্বাভাবিক ভাবেই ওলামা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নই। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের অসীম মেহেরবাণীতে দ্বীনকে সাধ্যমতো জানা ও বুঝার সুযোগ লাভ করেছি। দ্বীনের এ আলো এককভাবে কোন মহল থেকে আমি পাইনি। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাঃ)-এর তাফসীর "বায়ানুল কোরআন" ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য আমাকে দ্বীনী বিষয়ে নকলী ও আকলী দলিলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছে। তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস (রঃ)-এর আজীবন তাবলীগ সাধনা এবং তাবলীগ জামায়াতের বাংলাদেশের আমীর হযরত মাওলানা আবদুল আযীযের সাথে দীর্ঘ তাবলীগী সফর আমার জীবনে ইসলাম প্রচারে সত্যিকার প্রেরণা যুগিয়েছে। আর হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) থেকে আমি পেয়েছি ইসলামের ব্যাপক ধারণা, জীবন সমস্যার ইসলামী সমাধান, এ যুগের উপযোগী ইসলামী সংগঠনের বিজ্ঞানসম্মত কাঠামো ও বাতিল শক্তিকে অগ্রাহ্য করে ইসলামের বিজয়ের জন্য নির্ভীকভাবে কাজ করার অদম্য সাহস। এ ছাড়াও অগণিত ওলামার সান্নিধ্যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীর গুরুত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছে এবং তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুসলিম জীবনের বিভিন্ন গুণাবলী দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্যও হয়েছে।

আমি হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের বড় বড় আলেমগণের কয়েকজনের সাথে মিশবার সুযোগ পেলেও তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশের কয়েকজন আলেমের চরিত্র চিরদিন আমার অন্তরে প্রেরণা যোগাবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁদের একজনও বর্তমানে দুনিয়ায় নেই। তাদের পরিচয় অনেকেই জানে। আমি তাঁদের নাম অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ঃ

১। হযরত মাওলানা সাইয়েদ মাহমুদ মুস্তফা আল মাদানী শহীদ (রঃ)

২। হযরত মাওলানা সাইয়েদ শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

৩। হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী (রঃ)

৪। হযরত মাওলানা আতহার আলী (রঃ)

৫। হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ (রঃ)

৬। হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (রঃ)

৭। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান।

দ্বীনের খেদমতের ব্যাপারে এদের সবাই এক ধরনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন না। তাঁরা মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীও হননি। কিন্তু মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে এক শ্রেণীর আলেমগণের মধ্যে যে চরম বিদ্বেষ দেখা যায় তা তাঁদের মধ্যে কখনও দেখিনি।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় হবার পর পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের বড় বড় কয়েকজন আলেমের দরদ ভরা মন্তব্য এদেশের উপরোক্ত সাতজন মহান ব্যক্তির উদার মনের কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। পাকিস্তানের হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ, দেওবন্দের হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়েব, মজলিশে মুশাওরাতের সভাপতি মাওলনা মুফতী মুহাম্মদ আতীকুর রহমান, লক্ষ্ণৌর নাদওয়াতুল মুছান্নিফিনের হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী ও মাসিক আল-ফোরকানের সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মঞ্জুর নোমানীর মতো ব্যক্তিগণ মাওলানা মওদূদীর এন্তেকালে যে মহব্বতপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন তার ফলে আলেম সমাজে উদার মনোভাব বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ পাক এ মনোভাব সবার মধ্যে সৃষ্টি করে দ্বীনী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করুন—আমীন।

সমাপ্ত

অধ্যাপক গোলাম আযমের রচিত বই—এর তালিকা

কুরআন

১। কুরআন বুঝা সহজ
২। তাফহীমুল কুরআনের সার সংক্ষেপ
২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ পারা

সীরাতুন নবী

৩। সীরাতুন্ নবী সংকলন

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

৪। ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন
৫। ইকামাতে দ্বীন
৬। বাইয়াতের হাকীকত
৭। রুকনিয়াতের দায়িত্ব

জামায়াতে ইসলামী

৮। জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট
৯। জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ
১০। বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও জামায়াতে ইসলামী
১১। জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
১২। অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশ

১৩। আমার দেশ বাংলাদেশ
১৪। পলাশী থেকে বাংলাদেশ
১৫। বাংলাদেশের রাজনীতি
১৬। বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই

বিভিন্ন বিষয়

১৭। মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
১৮। কিশোর মনে ভাবনা জাগে
১৯। মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
২০। ধর্ম-নিরপেক্ষ মতবাদ